'প্রহেলিকা-সিরিজের' চতুর্দ্দশ গ্রন্থ



প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

কাল-বৈশাখীর ঝড়—



ছুরির ঝকঝকে ফলাটা ঠিক নাকের সামনে ধ'রে·

কাল-বৈশাখীর ঝড়

এক

ব্রডওয়ে হোটেলের ঘটনা চুকে যাবার পর রণজিৎ সামন্ত চঞ্চলকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসে বললেন, 'তুমি এখন কী করবে?'

চঞ্চল বললে, 'তাই তো ভাবছি। অনেক চেষ্টায় যা-ও একটা চাকরি জুটিয়েছিলাম, কপালে টি'কলো না।'

'ও-কাজ তোমার গেছে ভালোই হয়েছে। কী ব'লেই বা মেসের চাকরের কাজ নিয়েছিলে!'

'কেন, পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরির চেয়েও কি তা খারাপ?'

'খারাপ বইকি! কেরানিগিরিতে তবু ভদ্রতা বজায় থাকে। লোকে "আপনি" বলে। চেয়ারে বসতে দেয়।'

'আমি তো কোনো তফাৎ দেখতে পাইনে।'

'অত হতাশ হ'য়ে পোড়ো না, চঞ্চল। তোমার মতো বুদ্ধিমান্ শ্রমশীল ছেলের জীবনে উন্নতি হওয়া উচিত।'

'উন্নতি অনেক পরের কথা—আপাতত কাল কি খাবো তা-ই ভাবছি।'

'কেন, তার জন্যে আর ভাবনা কী! যতদিন তোমার কোনো কাজ-কর্ম্ম না জোটে, আমার এখানেই থাকবে।'

রণজিৎবাবু এত সহজে কথাটা বললেন যে, চঞ্চল 'না' বলতে পারলে না। মনে-মনে ভারি কুণ্ঠা বোধ করলো, কিন্তু র'য়ে গেলো। তবে এটা মনে-মনে ভেবে রাখলো যে, যত শিগগির পারে যে-কোনোরকম কাজ জুটিয়ে নিয়ে কোনো একটা মেসে উঠে যাবে। পরান্নে বেঁচে থাকার মতো দুঃখ কিছু নেই, এই তার ধারণা।

রণজিৎবাবু অবশ্য তাঁকে লালবাজারের ডিটেক্‌টিভ্ ডিপার্টমেণ্টেই কাজ দিতে চেয়েছিলেন। প্রথমে অবশ্য খুব কম মাইনেতে ঢুকতে হবে, তবে তার মতো তুখোড় ছেলের উন্নতি হবেই। বিশেষত, গোয়েন্দাগিরিতে তার মাথা বেশ খেলে এ তো দেখাই গেছে। রণজিৎবাবু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এটাই তার লাইন।

কিন্তু চঞ্চল পুলিশে কাজ নিতে রাজি হ'লো না।

রণজিৎবাবু একটু দুঃখিত হয়তো হ'লেন, কিন্তু পিড়াপিড়ি করলেন না। কয়েকদিন পর তিনি আর একটা চাকরির খবর এনে দিয়ে চঞ্চলকে বললেন, 'ছাখো এটা তোমার পছন্দ হয় কিনা।'

চাকরিটা একটু নতুন রকমের। রণজিৎবাবুর এক বন্ধু—

অটল দত্ত তাঁর নাম—একজন সেক্রেটারি চান। তিনি অবশ্য রাজনৈতিক কি সাহিত্যিক কি ব্যবসায়ী নন, কাজ-কর্ম কিছুই তিনি করেন না, প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, পায়ে পা তুলে দিন কাটান। ভদ্রলোক বিপত্নীক, ছেলেপুলে নেই, মস্ত বাড়িতে চাকরবাকর নিয়ে একা রাজত্ব করেন। সেইজন্য সেক্রেটারি চাই, আসলে সঙ্গী। একটু চিঠিপত্র লেখা, বই-টই প'ড়ে শোনানো, মাঝে-মাঝে গল্প-গুজব করা—কাজ বলতে গেলে এ-ই। মাইনে দেবে মাসে একশো টাকা।

চঞ্চল হাঁ হ'য়ে গিয়ে বললে, 'এই কাজের জন্য তিনি মাসে-মাসে একশো টাকা খরচ করবেন!' ভদ্রলোক কি পাগল?'

'তাঁর বাপের পয়সা তিনি যদি খরচ করেন তোমার আপত্তি কী?'

'না—না—আপত্তি কিছু নেই, তবে একশো টাকা তো অনেক টাকা—অত দিয়ে আমি কী করবো!'

'তাছাড়া', রণজিৎবাবু বলতে লাগলেন, 'তোমাকে ও-বাড়িতেই অবশ্য থাকতে হবে। খাওয়া-দাওয়াও অটলবাবুর টেবিলেই চলবে। ঐ একশো টাকা স্রেফ হাত-খরচ হিসেবেই তিনি দেবেন।'

'বলেন কী! এ যে আলাদিনের প্রদীপের মতো শোনাচ্ছে!'

'অবশ্য অসুবিধেও আছে। তোমার এ-চাকরিতে বাঁধা কাজ যেমন কিছু নেই তেমনি বাঁধা সময়ও নেই। দিনে

রাত্তিরে যখন-তখন তোমার ডাক পড়তে পারে—মাঝ-রাত্তিরে ঘুম থেকে ডেকে তোলাও অসম্ভব নয়। ভদ্রলোক এমনিতেই একটু খেয়ালি, কখন কী মরজি হয় ঠিক নেই। তার উপর তিনি চিররুগ্ন—তাই তাঁর মেজাজও খুব নির্ভরযোগ্য নয়।'

'তাঁর অসুখটা কী?'

রণজিৎবাবু হেসে বললেন, 'বড়োলোকের কি আর অসুখের অভাব আছে, ভাই! সত্যি না-থাকলে মিথ্যে অসুখ বানিয়ে নিতে কতক্ষণ? তা তার জন্যে তুমি ভেবো না—ডাক্তার-নার্সের ঘনঘটা যথেষ্ট আছে—তুমি শুধু মিহি ধুতি-পাঞ্জাবী প'রে বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে আর বাবুর মেজাজ খোশ রাখবে।'

'অর্থাৎ—রাজসভার ভাঁড় গোছের একটি জীব হ'তে হবে আমাকে। বেশ, তা-ই হবো। এমন লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দেয়া কোনো কাজের কথা নয়।'

'তাহ'লে চলো আজ বিকেলে তোমাকে নিয়ে অটলবাবুর ওখানে একবার যাই।'

'বেশ, চলুন।'

'কিছু মনে কোরো না—অটলবাবুর ওখানে খুব ধোপ-দুরস্ত হ'য়ে যাওয়া চাই। তোমার জন্য একখানা তাঁতের ধুতি আর একটা সিল্কের পাঞ্জাবী কিনে রেখেছি। আর তোমার চাকরি হ'লেই কিছু ভালো-ভালো জামা-কাপড় কিনে নিয়ো—আমার চেনা দোকান আছে—মাইনে পেয়ে দাম দিলেই চলবে। খুব ফিটফাট হ'য়ে থাকা চাই—বুঝলে?'

বিকেল পাঁচটা নাগাদ রণজিৎবাবু চঞ্চলকে নিয়ে অটলবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হ'লেন।

শোভাবাজার অঞ্চলে তাঁর বিরাট পৈতৃক বাড়ি—প্রাসাদ বললেও চলে। গারাজে চার-পাঁচখানা গাড়ি ঝক্‌ঝক করছে। ঘাসের জমি, ফোয়ারা, মর্ম্মরমূর্তি, পামগাছ—কিছুরই অভাব নেই। এই পৌরাণিক ঐশ্বর্যের কারাগারে বন্দী হ'য়ে থাকতে হবে ভাবতে চঞ্চলের একটু মন খারাপ হ'য়ে গেলো।

কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় প্রকাণ্ড বসবার ঘরে তারা বসলো। লাল মখমল-মোড়া পুরোণো আমলের আসবাব-পত্রে ঘরটি সাজানো। দেওয়ালে অতীতযুগের দত্তকুলপ্রদীপদের বড়ো-বড়ো তেলের ছবি। সীলিং থেকে ঝুলছে, ঝাড়লণ্ঠন, তবে তাতে ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব্‌ বসানো হয়েছে।

তারা যাওয়া মাত্রই একজন চাপকান-পরা চাকর এসে রণজিৎবাবুর ভিজিটিং কার্ড নিয়ে চ'লে গেলো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না—মিনিট পাঁচেক পরেই স্বয়ং গৃহস্বামী ঘরে এসে ঢুকলেন।

অটল দত্ত মানুষটা মস্ত। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, তার উপর মুখভরা ঘন দাড়ি-গোঁফে চেহারা আরো জমকালো হয়েছে। মাঘের শেষ, কলকাতায় শীত পালাই-পালাই করছে, কিন্তু দত্তমশায়ের পোষাক যেন দারজিলিং-এর উপযোগী। মস্ত ঢোলা সিল্কের পাজামা পরেছেন, পায়ে মোজা আর কার্পেটের চটি, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি তার উপর কোমরে দড়ি-

বাঁধা কালো কাপড়ের আলখাল্লায় গলা থেকে পা পর্যন্ত জড়ানো। মোটের উপর নাক, চোখ, কপাল আর হাত দু'খানা বাদ দিয়ে শরীরের যতটা সম্ভব তিনি ঢেকে রেখেছেন, হয় কাপড়ে নয় দাড়িগোঁফে। মাথায়ও তাঁর লম্বা-লম্বা বাবরি চুল, যেটুকু দেখা যায় গায়ের রং টুকটুকে লাল, সব মিলিয়ে হঠাৎ দেখলে রবীন্দ্রনাথ ব'লে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। বয়েস পঞ্চাশ হবে। চঞ্চল অবাক হ'লো এই ভেবে যে এই বিরাট পুরুষের দেহে এমন-কী সাংঘাতিক রোগ লুকিয়ে থাকা সম্ভব যার জন্য ভদ্রলোক সব সময় ডাক্তার-নর্স-পরিবৃত হ'য়ে থাকেন!

অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর অটলবাবু বললেন—'এই বুঝি—এই বুঝি সেই ছেলেটি—যার কথা আপনি বলছিলেন?'

চঞ্চল লক্ষ্য করলো যে অটলবাবুর চেহারার সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরের কিন্তু মোটেও মিল নেই। তাঁর গলার আওয়াজ দুর্বল—থেমে-থেমে, আস্তে-আস্তে কথা বলেন, তাঁকে চোখে না দেখে শুধু তাঁর কথা শুনলে এ-ধারণাই হবে যে তিনি একজন রোগী।

রণজিৎবাবু বললেন, 'হাঁ, এর নাম চঞ্চল নাগ, এর বিষয়ে সব কথা তো আপনাকে বলেছি। ছেলেটি ভারি ভালো। আমার মনে হয়—'

অটলবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক, আপনাকে আর

বলতে হবে না। আমি একেই নেবো স্থির করেছি। কাজ তো কিছু নয়—একা-একা শূন্যপুরীতে থাকি, মন ভালো লাগে না, কাছে কেউ থাকলে কথাবার্তা ক'য়ে সময় কাটাতে পারি। কী হে, পারবে তো এই রুগ্ন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের সঙ্গী হ'তে?'

চঞ্চল মনে-মনে বললে, 'আপনি রুগ্নও নন, বৃদ্ধও নন; আর নিঃসঙ্গ যদি হন তারও কারণ আপনারই খেয়াল।' মুখে বললে, 'পারবো না কেন, নিশ্চয়ই পারবো।'

'তাহ'লে কাল সকালেই চ'লে এসো।'

চঞ্চল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

'হাঁ, ভালো কথা—তুমি কী-রকম পাবে-টাবে সে-কথা তো রণজিৎবাবুর মুখে শুনেছো। ওতে চলবে তো?'

চঞ্চল হেসে বললে, 'আজ্ঞে অত টাকা দিয়ে আমি কী করবো তাই ভাবছি।'

অটলবাবু শুকনো একটু হেসে বললেন, 'নেহাৎ ছেলেমানুষ আছো, তাই ও-রকম মনে হয়। কয়েক বছর পরেই বুঝবে যে ও-টাকা কিছুই টাকা নয়।'

এর পরে রণজিৎবাবুর সঙ্গে কিছু খুচরো আলাপ ক'রে অটলবাবু তাঁদের বিদায় দিলেন, কিন্তু তার আগে চা আর সন্দেশ না খাইয়ে ছাড়লেন না।

বাইরে এসে চঞ্চল বললে, 'ভদ্রলোক ভারি চমৎকার মানুষ মনে হ'লো।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো মানুষ ব'লে ওঁর বিশেষ একটু সুনামই আছে।'

'কিন্তু কেমন যেন ম্রিয়মাণ! অমন প্রকাণ্ড জাঁদরেল শরীর, অথচ মনে-মনে একেবারেই যেন মিইয়ে আছেন!'

'ওঁর কী একটা ব্যামো আছে—সেই জন্যেই উনি কেমন যেন হ'য়ে গেছেন! যাই হোক, কাজটা তোমার মন্দ হ'লো না, কী বলো?'

'মন্দ হ'লো না কী বলছেন? চমৎকার! এর চেয়ে ভালো কিছুই হ'তে পারে না।'



দুই

পরের দিন সকালে উঠে এক পেয়ালা চা খেয়েই চঞ্চল তার নতুন কর্মস্থলে চ'লে গেলো। সঙ্গে তার নতুন স্যুটকেস, নতুন ধুতি পাঞ্জাবি গেঞ্জি রুমাল তোয়ালে জুতোয় ঠাসা, আয়না সাবানও বাদ পড়েনি। আগের দিন অটলবাবুর বাড়ি থেকে ফেরবার পথে রণজিৎবাবু ও-সব কিনে দিয়েছিলেন, বড়োলোকের বাড়ির কাজ, সব সময় ফিটফাট থাকা চাই। রণজিৎবাবু বার-বার বললেন, 'প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই আমার এ টাকা শোধ ক'রে দিয়ো কিন্তু,' কারণ তা না-হ'লে চঞ্চল ও-সব নিতে কিছুতেই রাজি হ'তো না। তারপর চঞ্চল যখন রিকশায় উঠছে, রণজিৎবাবু চঞ্চলের হাতে একটি খাম দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যাও।'

'কী এটা?' ব'লেই চঞ্চল খামটা খুলে দেখলো ভিতরে দু'খানা দশ টাকার নোট। সে অবাক হ'য়ে বললে, 'এ দিয়ে কী হবে?'

'রেখে দাও—যদি দরকার হয়। এক মাসের আগে তো আর মাইনে পাবে না।'

'কী আশ্চর্য—'

'আহা—আমি তো আর তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি না। ফিরিয়ে দিয়ো—না হয় সুদ দিয়ো, তাহ'লেই তো হবে।'

চঞ্চল আর-কিছু বললে না। রণজিৎবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায়

তার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। অনেক কপালগুণে এ রকম বন্ধু পাওয়া যায়।

অটলবাবুর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেখলো তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই প্রস্তুত। তাকে অভ্যর্থনা করলে কর্তার গোমস্তা তিনকড়ি। বেঁটে খাটো শুকনো বুড়োমতো মানুষটি, তিরিশ বছর এ-বাড়ির কাজে লেগে আছে, এখানকার যা-কিছু খুঁটিনাটি আঁটঘাট সব তার জানা।

সে তাকে নিয়ে গেলো সোজা তেতলায়, সেখানে এক কোণায় তার জন্য যে-ঘরটি ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে, তা দেখে তার তো চক্ষুঃস্থির!

সে কি হঠাৎ বর্ধমানের মহারাজা হ'য়ে গেলো? সে কি স্বপ্ন দেখছে? মস্ত ঘর, মেঝে শাদা-কালো পেটেন্ট স্টোনের, এত পরিষ্কার যে পা ফেলতেই ভয় হয়—আর আসবাব পত্র, তার তো কথাই নেই! স্প্রিং-এর গদি-পাতা খাট, ড্রেসিং টেবিল, মস্ত-মস্ত দেরাজ, ছোটো-বড়ো নানা ছাঁদের টেবিল, ইজি-চেয়ার, সোফা, তাছাড়া বিছানার পাশে ছোট্ট টেবিলে দুটি টেলিফোন—একটি কালো, একটি শাদা। পাশেই ঝকঝকে বিলেতি বাথরুম, সেটি এত বড়ো যে অনায়াসে থাকবার ঘর হ'তে পারে। এত ঐশ্বর্য, এত বিলাসিতা চঞ্চল কখনো ছাখেনি, তার মাথার ভিতরটা যেন ঝিমঝিম করতে লাগলো।

তিনকড়ি বললে, 'কেমন? আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

'হবে বইকি', চঞ্চল গম্ভীরভাবে বললে, 'খুবই অসুবিধে হবে। ও-বিছানায় শুয়ে কি আমার ঘুম হবে ভেবেছেন? না ঐ বাথরুমে স্বাধীনভাবে নাইতে পারবো? মেসের তক্তাপোষে প'ড়ে থাকা অভ্যেস, কলতলার চৌবাচ্ছায় ঘটি দিয়ে জল তুলে দুমদাম ক'রে চান করা—হঠাৎ এত সুখ সইবে কেন? আপনাদের এখানে অন্যরকম ব্যবস্থা বুঝি হয় না? একতলায় কোনো ঘর-টর খালি নেই? দরোয়ানের ঘর হ'লেও চলে।'

তিনকড়ি বললে, 'না, না, এর আর বদল হবার উপায় নেই। কর্তার হুকুমেই এ-সব হয়েছে। এর পাশেই তাঁর মহল—তিনখানা ঘর নিয়ে তিনি থাকেন। আপনাকে যখন-তখন দরকার হ'তে পারে, তাই আপনার ঠিক পাশেই থাকা চাই। ঐ দেখুন, আপনার লেখবার টেবিলের ধারে দেয়ালের গায়ে ইলেক্‌ট্রিক বেল বসানো আছে, ওটি যখন বাজবে বুঝবেন কর্তা তলব করেছেন। টেবিলের ডান দিকের দরজা দিয়ে বেরোলেই তাঁর মহলে গিয়ে পড়বেন। ওঁর খাশ টেলিফোনটি আপনার ঘরেই রাখা হ'লো—ওঁর ঘরেও এক্সটেনশন আছে, কিন্তু নেহাৎ দরকার না-হ'লে ওঁকে বিরক্ত করবেন না। টেলিফোনে ওঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে চাইলে আপনি ফোন রেখে দিয়ে শাদা টেলিফোনটি তুলবেন। সেটির কনেকশন শুধু আপনার ঘরের সঙ্গে ওঁর ঘরের। তিনি যদি নিজে কথা বলতে চান, তাহ'লে ওঁকে কনেকশন দিয়ে

দেবেন, নয়তো যা বলবার আপনাকেই বলতে হবে। এ ছাড়া আর যা আপনার কাজ, তা উনি নিজেই আপনাকে ব'লে দেবেন।'

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলে, 'এখন কি আমাকে কিছু করতে হবে?'

তিনকড়ি হেসে বললে, 'না, না, এই তো এলেন। এখন একটু বিশ্রাম করুন। এঁদের কাজ তো আপিশের কাজের মতো টাইম-বাঁধা নয়—হয়তো দিনের পর দিন ব'সেও বসতে হচ্ছে না—আবার হঠাৎ এমন চাপ পড়লো যে দিনে খাওয়া হয় না, রাত্তিরে ঘুম চুলোয় যায়। হ্যাঁ—একটা কথা, আমাকে তো সব সময় পাবেন না, যখন যা দরকার তারাকে ডেকে বলবেন—সে আপনারই খাশ চাকর, আপনার দরজার বাইরে সব সময় সে মোতায়েন থাকবে। ঐ টেবিলের গায়ে লাগানো বেলটা একবার টিপুন।'

চঞ্চল বেল টিপতেই দরজার বাইরে ক্রিং-ক্রিং ক'রে শব্দ হ'লো, আর সঙ্গে-সঙ্গেই বছর বারো-তেরোর ফুটফুটে একটি ছেলে ঘরে ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

তিনকড়ি বললে—'এই যে, এর নাম তারা। একে দরকার হ'লেই ঐ বেলটা টিপবেন, হাঁকডাক না-করাই ভালো। কত্তা চ্যাঁচামেচি একেবারেই সইতে পারেন না। এখন কি আপনার কোনো দরকার আছে?'

'না, না, দরকার আর কী—ওকে না হ'লেও আমার চলতো।'

তিনকড়ি গম্ভীরভাবে বললে, 'আপনার চলতে পারে, কিন্তু শোভাবাজারের দত্তদের চলে না। তাঁদের একটা মান-সম্ভ্রম আছে তো। তারা, এক কাজ কর্, বাবুর স্যুটকেস খুলে জামা-কাপড়গুলো দেরাজে গুছিয়ে রাখ্। চাবিটা ওকে দিন।'

'ওটা খোলাই আছে।'

তারা স্যুটকেস খুলে সমস্ত কাপড়চোপড় চটপট দেরাজে গুছিয়ে ফেললো—অতটুকু ছেলের নৈপুণ্য দেখে চঞ্চল অবাক না-হ'য়ে পারলে না।

'ঠিক আছে। এখন তুই যা।'

তারা চ'লে যাওয়ার পর তিনকড়ি বললেন, 'আমিও এখন যাই—আপনার খাবারটা পাঠিয়ে দিইগে।'

চঞ্চল অবাক হ'য়ে বললে, 'খাবার! এখন খাবার কেন? মোটে তো ন'টা বাজলো!'

'এখনই তো খাবার সময়। দুপুরের খাওয়ার দেরি আছে—একটার সময়। তখন আপনি কত্তার সঙ্গে ব'সেই খাবেন—তিনি তা-ই বলেছেন।'

'তা হোক, এখন আমার কিছু না খেলেও চলতে পারে।'

'না, না, তা কি হয়! আপনি ব্যস্ত হবেন না, এ-বাড়ির হালচাল দু'দিনেই বুঝে নেবেন।'

এই ব'লে তিনকড়ি বেরিয়ে গেলো। মিনিট কুড়ি পরে টোকা পড়লো ঘরের দরজায়। চঞ্চল ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলো একজন উর্দি-আঁটা চাকর ধবধবে শাদা

কাপড়ে ঢাকা মস্ত একটি ট্রে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে সেলাম ক'রে সে ট্রে-টি রাখলো কাঁচ-বসানো গোল টেবিলের উপর। তারপর ট্রের উপরকার কাপড়টি তুলে নিয়ে আবার সেলাম ক'রে একটি কথা না-ব'লে বেরিয়ে গেলো—যাবার সময় ঘরের দরজাটি ভেজিয়ে দিতেও ভুললো না।

এ কী কাণ্ড! দু'দিন আগেও যে ছিলো মেসের চাকর, তার কিনা আজ এই রাজার হাল! বিলিতি বাসনে ক'রে চা, ডিম, রুটি-মাখন, সন্দেশ, সরভাজা, কলা, আপেল—একজন মানুষ কি এত খেতে পারে! সুসজ্জিত সুদৃশ্য খাবারগুলির দিকে চঞ্চল খানিকক্ষণ শুধু তাকিয়েই রইলো—বাস্তবিক, এ দেখেও সুখ! তারপর আস্তে-আস্তে খেতে আরম্ভ করলো, বাসনগুলো নাড়াচাড়া করতেও তার ভয় হ'লো—পাছে টুক ক'রে কোনোটা ভেঙে যায়! যাই হোক, আস্তে-আস্তে খেতে-খেতে আধঘণ্টার মধ্যে সে সবই খেয়ে উঠলো—সত্যি যে তার পেটে এত খিদে ছিলো তা আবিষ্কার ক'রে সে নিজেই গেলো অবাক হ'য়ে। তারা এসে বাসনগুলো নিয়ে চ'লে গেলো, তারপর চঞ্চল গদি-আঁটা মস্ত ইজি-চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে একখানা নভেল খুলে বসলো—তার স্যুটকেসে খানকয়েক বইও সে নিয়ে এসেছিলো। চারদিক চুপচাপ, জানলা দিয়ে প্রথম বসন্তের ঝিরঝিরে হাওয়া গায়ে এসে লাগছে, বইয়ের পাতার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে চঞ্চল মনে-মনে বললে—এত সুখ আমার কপালে সইলে হয়!

তিন

ঠিক একটার সময় গং ক'রে একটা গম্ভীর মধুর ঘণ্টা বাজলো।. তারা এসে বললে—খাবার দেয়া হয়েছে। চলুন।

ইতিমধ্যে চঞ্চল স্নান ক'রে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে যথাসম্ভব ফিটফাট হ'য়ে নিয়েছিলো। তারার পিছন-পিছন সে অটলবাবুর খাশ মহলে এসে ঢুকলো। পাশাপাশি তিনটে ঘর, সংলগ্ন চওড়া বারান্দা বরাবর চ'লে গেছে। প্রথম ঘরটি —এটি চঞ্চলের ঘরের ঠিক পাশে—তাঁর শোবার ঘর। দ্বিতীয় ঘরটি ছোটো, সেটি খাবার ঘর। তারপরে আর-একটি মস্ত ঘর, সেটি বসবার ঘর, কিন্তু তার ব্যবহার বড়ো একটা হয় না। দোতলায় পুরোনো আমলের বৈঠকখানাতেই অটলবাবু লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।

চঞ্চলকে ঢুকতে হ'লো খাবার ঘরে। গোল টেবিল দু'জনের মতো সাজানো, আশে-পাশে চাকররা ঘোরাঘুরি করছে। দেয়ালে ঝুলছে ভারতীয় চিত্রকলার কয়েকটি নিদর্শন। চঞ্চল তারই একটি ছবি মন দিয়ে দেখছে, এমন সময় অটলবাবু ঘরে ঢুকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। চঞ্চলও তাড়াতাড়ি স'রে এসে তাঁর পাশের জায়গাটিতে বসতে যাবে, হঠাৎ অটলবাবু অদ্ভুত উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলেন—'এ কী! এ-সব কী?'

চাকর তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে, 'হুজুর !'

'এ-সব কী ?' ব'লে অটলবাবু টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

চঞ্চল ঠিক বুঝতে পারলে না ব্যাপারটা কী। চাকরটিও হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো !

কোত্থেকে তিনকড়ি ছুটে এসে বললে, 'আজ্ঞে ভুল হ'য়ে গেছে। ও-লোকটা নতুন, ওকে ব'লে দেয়া হয়নি। এই— হুজুরের ছুরি-কাঁটা সরিয়ে নিয়ে যাও। কোনোদিন আর ও-সব দেবে না।'

চাকরটি নিঃশব্দে আদেশ পালন করলে। চঞ্চল বললে, 'তাহ'লে আমার গুলোও তুলে নিতে বলুন। কোনোদিন ছুরি-কাঁটা দিয়ে খেয়ে অভ্যেস নেই—'

'বেশ তো', তিনকড়ি বললে, 'আপনি হাত দিয়েই খাবেন।'

একটু পরে অটলবাবু বললেন, 'ও-জিনিসগুলো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। যত সব বিজাতীয় উপদ্রব। এদিকে বাবার আমল থেকে ও-সব জিনিস অনেক রয়ে গেছে— ওগুলোকে ফেলে দিতেও পারিনে। তিনকড়ি, এ-রকম ভুল চাকররা যেন আর কক্ষনো না করে, বুঝলে ?'

'আজ্ঞে ওদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে ব'লে দেবো।'

'এসো হে চঞ্চল, আরম্ভ করা যাক', ব'লে অটলবাবু শুক্তো দিয়ে একটু ভাত মাখলেন।

ভদ্রলোকের এই ছুরিকাঁটা-বিদ্বেষ চঞ্চলের কিন্তু একটু



"এ-রকম ভুল চাকররা যেন আর কক্ষনো না করে।"

পৃঃ—১৬

অস্বাভাবিক ঠেকলো। হয়তো তিনি দিশি আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী, হয়তো সেটা ভালোই, কিন্তু চাকরটা ভুল ক'রে ছুরি-কাঁটা সাজিয়ে দিয়েছিলো ব'লে এমন উত্তেজিত হবারই বা কী কারণ হ'তে পারে? অটলবাবুর মুখ পর্যন্ত যেন একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিলো, কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরও কাঁপছিলো। কী জানি, চঞ্চল মনে-মনে ভাবলে, বড়লোকরা বোধ হয় এইরকমই, তাঁদের বাঁধা নিয়মের পান থেকে চুণ খসলেই বোধ হয় তাঁরা চ'টে যান।

অটলবাবুর খাওয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই হ'য়ে গেলো। তিনি খেলেন ঠিক দু' চামচে ভাত, একটু শুক্তো, একটু মাছের ঝোল, খানিকটা পুডিং। অত অল্প খেয়ে অত বড়ো মানুষটা বেঁচে থাকেন কী ক'রে? এদিকে রান্নার বিপুল আয়োজন, কত রকম মাছ-মাংস তরকারি, সে আর ফুরোয় না—এত সব রান্না কি শুধু চঞ্চলেরই জন্য? চঞ্চল মনে-মনে অত্যন্ত লজ্জিত হ'লো।

যেন তার মনের কথাটা আঁচ ক'রে নিয়ে অটলবাবু বললেন, 'তুমি তাড়াহুড়ো কোরো না, আস্তে-আস্তে খাও, আমি বসছি।' টেবিলে ব'সেই তিনি হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে একটা মোটা চুরুট ধরালেন।

চঞ্চল ভয়ে-ভয়ে বললে, 'অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি।'

'বলো, বলো, যা ইচ্ছে তা-ই বলো। তোমার কাজই তো

আমার সঙ্গে কথা বলা। আমার চেহারাটা ভয়ঙ্কর হ'তে পারে কিন্তু মানুষটা আমি নেহাৎ মন্দ নই।'

চঞ্চল বললে, 'আপনি তো কিছুই খেলেন না, তাহ'লে অনর্থক এত সব—'

'অনর্থক কেন? তুমি খাবে।'

'আমার জন্যে এত সব কেন? আপনি যা খান আমি তো তা-ই খেতে পারি।'

অটলবাবু হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, 'পাগল নাকি! আমার অসুখ ব'লে অনেক-কিছুই খাওয়া বারণ, তাই ব'লে তুমি কেন কষ্ট করবে? খাও, খাও, লোককে খেতে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।'

চঞ্চল সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী অসুখ আপনার?'

অটলবাবু হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'সে আছে নানারকম।' তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে আবার হেসে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই মনে-মনে ভাবছো আমি সব সময় এ-রকম ভারি কাপড়চোপড় প'রে থাকি কেন?'

চঞ্চল প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলো যে এই দুপুরবেলাতেও অটলবাবুর পরনে সেই সব ভারি কাপড়চোপড়। পায়ে মোজা, গলা থেকে পা পর্যন্ত আলখাল্লা। মাঘের শেষ, দুপুর-বেলাটা রীতিমতো তেতে ওঠে, এ-সময়ে এ-রকম পোষাক প'রে বাড়িতে ব'সে থাকা একটু আশ্চর্য বইকি।

চঞ্চলের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না-ক'রে অটলবাবুই আবার

বললেন, 'এরও কারণ আমার অসুখ। বারোমাস আমাকে এইরকম কাপড়চোপড় প'রে থাকতে হয়।'

'গ্রীষ্মকালেও ?'

'হাঁ, গ্রীষ্মকালেও। আর বলো কেন—আমার মতো স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকাই এক বিড়ম্বনা।'

চঞ্চল বললে, 'আপনাকে দেখে কিন্তু একটুও অসুস্থ মনে হয় না।'

'সেটাই তো আরো খারাপ। আমাকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমার কোনো অসুখ থাকতে পারে। অথচ—'

অটলবাবু অত্যন্ত আকস্মিকভাবে থেমে গেলেন।

চঞ্চলের মনে হ'লো তাঁর অত বড়ো শরীর যেন মুহূর্তের জন্য একটু কেঁপে উঠলো। একটু পরে, নিজেকে যেন সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'এখানে তোমার বোধ হয় খুব ভালো লাগবে না, সমবয়সী কেউ নেই—'

'না, না, কিচ্ছু খারাপ লাগবে না।'

'তোমার যখনি বেরোবার ইচ্ছা হবে আমাকে বোলো—লজ্জা কোরো না। মাঝে-মাঝে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এসো। সিনেমা দেখতে ভালোবাসো ?'

'আপনি কি সব সময় বাড়িই থাকেন ?'

'বেশির ভাগই। এক-আধ সময় গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাই। ঘরেই আমার ভালো লাগে।...আচ্ছা, আমি

উঠি এখন। তুমি একটু বিশ্রাম করো গিয়ে, আধঘণ্টাখানেক পরে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।'

খাওয়ার পরে চঞ্চল স্প্রিংএর গদি-আঁটা বিছানায় একটু গড়িয়ে নিলে। ঠিক আধ ঘণ্টা পরে তার ঘরের ঘণ্টা বেজে উঠলো। চঞ্চল এক মুহূর্তও দে'রি করলে না, গিয়ে হাজির হ'লো অটলবাবুর শোবার ঘরে।

প্রকাণ্ড ঘর। আর তাতে আসবাবপত্র যে কত রকম, তার বর্ণনা না-দিলেও চলবে। জানলার ধারে একটি বিশাল ইজি-চেয়ারে অটলবাবু ডুবে আছেন। হাতের কাছে টেবিলে কয়েকটি বই। তা থেকে একটি মোটা বই তুলে নিয়ে তিনি বললেন, 'এসো, চঞ্চল। নতুন "রবীন্দ্র-রচনাবলী" এসেছে। "লক্ষ্মীর পরীক্ষা"টা আমাকে একটু প'ড়ে শোনাও তো।'

চঞ্চল বইখানা হাতে নিয়ে বললে, 'পাতাগুলো কাটা নেই। একটা ছুরি—'

অটলবাবু কেমন যেন চমকে উঠে বললেন, 'না, না, ও-সব নেই, ও-সব আমার কাছে থাকে না।'

চঞ্চলের মনে হ'লো 'ছুরি' কথাটাও তিনি যেন উচ্চারণ করতে চান না।

'ঐ টেবিলের উপর ছাখো একটা paper-cutter আছে, তা দিয়ে যা-হয় ক'রে নাও।'

ভদ্রলোক কি ঘোর বৈষ্ণব? চঞ্চল মনে-মনে ভাবলে,

ছুরি, কাটা, এ-সব কথা মুখে পর্যন্ত আনতে চান না! না, তা তো হ'তে পারে না! এদিকে মাছ-টাছ তো খান।

পাতা কেটে নিয়ে চঞ্চল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' পড়তে আরম্ভ করলো। অটলবাবু খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলেন, তাঁর যে খুব ভালো লাগছে সেটা বেশ্ বোঝা গেলো। কিন্তু আদ্ধেক পড়া হ'তেই তিনি বললেন, 'আজ এই থাক, কাল আবার শুনবো। রেডিওটা উনিশ মিটারে একটু দাও তো—তিনটের সময় মস্কো থেকে ইংরিজিতে খবর বলে—কী বলে ওরা শোনা যাক।'

দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড একটি রেডিওগ্রাম দাঁড়িয়ে ; চঞ্চল বই বন্ধ ক'রে উঠে উনিশ মিটারে মস্কো ধরলে। দামি সেটে কথাগুলো এত পরিষ্কার আসতে লাগলো যেন কেউ ঘরে ব'সে কথা বলছে।

মিনিট কুড়ি রুশ খবর শোনা হ'লো, তারপর অটলবাবু বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের নতুন বই ক'টা আনতে হবে। একটা চিঠি লিখে দাও তো দোকানে। ঐ টেবিলে কাগজ-কলম সব আছে।'

চঞ্চল টেবিলের ধারে ব'সে দেখলো নানা আকারের নানা ছাঁদের দামি-দামি চিঠির কাগজ সাজানো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কলম বলতে আছে কয়েকটা পালকের কলম, আর মাটির দোয়াতে দিশি কালি—একটা ফাউণ্টেন পেন কি একটা নিবের কলম কি একটা পেন্সিল পর্যন্ত নেই। আজকালকার

দিনে কেউ যে পালকের কলমে লেখে, তা তার ধারণা ছিলো না। বিশেষত অটলবাবুর মতো ধনী, সব বিষয়েই সব-চেয়ে-ভালোটি না-হ'লে যাঁর চলে না, তিনি কেন আদ্যিকালের পালকে লিখতে যাবেন! সে জিজ্ঞেস না-ক'রে পারলে না, 'আপনি এই কলমে লেখেন!'

অটলবাবু একটু যেন লজ্জিতভাবে বললেন, 'আমরা সেকেলে লোক, ও-সব সেকেলে জিনিসই আমাদের ভালো। তুমি অবশ্য ইচ্ছে করলে ফাউণ্টেন-পেনে লিখতে পারো। তোমার নিজের না থাকে, আমি আনিয়ে দেবো'খন।'

'না, না, কী আশ্চর্য, আমি এমনিই জিজ্ঞেস করলুম কথাটা। ফাউণ্টেন-পেন দরকার হ'লে আমি নিজেই কিনে নেবো।...হ্যাঁ, কী-কী বই আনাবেন, বলুন।'

অটলবাবু বইগুলোর নাম ব'লে গেলেন, আর চঞ্চল চিঠিটা লিখে ফেললো। তারপর আরো দু'একটা চিঠি লিখতে হ'লো, একটা ওষুধের দোকানে, একটা কর্পোরেশনের আপিশে। শেষেরটা ইংরেজিতে, তাই টাইপ ক'রে দিতে হ'লো। "কলকাতা হরকরা"র আপিশে কাজ করবার সময় এ-সব কাজই সে অল্প-বিস্তর শিখেছিলো।

টাইপ-রাইটারটা বন্ধ ক'রে রাখতে-রাখতে চঞ্চল বললে, 'কলমের ব্যাপারে আপনি এত সেকেলে, অথচ টাইপরাইটার তো রেখেছেন।'

'ইংরেজি লেখার জন্য আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করতে দোষ

নেই। ও-সব যাবনিক ভাষা কিনা, তাই লেখবার উপায়ও দানবিক। পবিত্র দেবভাষার কন্যা আমাদের বাংলাভাষাকে কি বিশুদ্ধ পালকের কলম ছাড়া অন্য-কিছুতে মানায়!'

চঞ্চল হেসে বললে, 'চমৎকার থিওরি! এ-বিষয়ে আপনি একটি প্রবন্ধ লিখলে মন্দ হয় না।'

অটলবাবুও হেসে বললেন, 'তোমরা ছেলে-ছোকরা মানুষ, তোমরা তো এ নিয়ে হাসিঠাট্টা করবেই। সে যাক্‌গে, এখন তোমার ছুটি। সাড়ে চারটের সময় আমাকে "মাসাজ" করবার জন্য লোক আসবে, তার আগে একটু বিশ্রাম ক'রে নিই।'

চঞ্চল আর-কোনো কথা না-ব'লে নিজের ঘরে চ'লে এলো। এই নাকি তার একদিনের কাজ! এ তো কিছুই নয়।



চার

চঞ্চলের নতুন চাকরির প্রথম সপ্তাহ কেটে গেলো। কাজ তার নাম-মাত্র; দিনে পাঁচবার রাজার হালে খাওয়া আর মসৃণ বিলাসিতার মধ্যে সময় কাটানো—এ-অবস্থা তার পক্ষে একান্তই অবিশ্বাস্য। ইতিমধ্যেই তার চেহারায় সুখে থাকার চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে : তার গাল উঠেছে ভ'রে এবং সে-গালে লেগেছে লালের আভা। এ-ভাবে যদি মাসখানেক চলে, চঞ্চল মনে-মনে বললে, তাহ'লে আমি রীতিমতো মোটা আর রীতিমতো ভোঁতা হ'য়ে যাবো।

কিন্তু বেশিদিন এই আরামে কাটানো চঞ্চলের কপালে ছিলো না। হঠাৎ এমন ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনা ঘটলো যা কখনো কল্পনাও করা যায় না।

তবে ভবিষ্যৎ তো কেউ দেখতে পায় না, তাই চঞ্চল এখন বেশ নিশ্চিন্তই। আপাতত সে অটলবাবুর সম্বন্ধে মনে-মনে কতগুলো কথা ভেবে নিয়েছে। সেগুলো এই :

প্রথমত, ভদ্রলোক জীবনটা কাটান একেবারেই কিছু না-ক'রে। বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনার ভার সম্পূর্ণ কর্মচারীদের 'পরেই ন্যস্ত, হয়তো তারা প্রচুর চুরিও করে (তিনকড়ির নাকি দেশে তিনখানা পাকা বাড়ি আর বিস্তর জমি-জমা), কিন্তু সে-বিষয়ে ভদ্রলোক একেবারেই উদাসীন। তার একমাত্র

কারণ—চঞ্চল যতদূর বুঝতে পেরেছে—তাঁর অগাধ শারীরিক আলস্য। এত অলস মানুষ চঞ্চল কখনো ছাখেনি। যে-সব কাজ করবার জন্য তাকে রাখা হয়েছে, তা কোনো কাজই নয়; কিন্তু ভদ্রলোক এতই অলস যে বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দেবার জন্যও লোক দরকার—ব'সে-শুয়ে থাকা ছাড়া কিছুই যেন তিনি পারেন না। সেইজন্যই চঞ্চলের কপালে এমন সুখের চাকরিটা জুটেছে। কিন্তু এত অল্প কাজ তার আবার ভালো লাগে না—শরীর-মন প্রায়ই ছটফট করে।

দ্বিতীয়ত, অটলবাবু লোক সত্যি খুব ভালো। শুধু যে ভালোমানুষ তা নন, বেশ বুদ্ধিমান ও উচ্চশিক্ষিত। লেখাপড়া, গান-বাজনা, চিত্রকলা সবটাতেই খুব উৎসাহ আছে। বাড়ি-ভরা বই, ছবি, গ্রামোফোনের রেকর্ড। কখনো বই পড়েন—কিংবা চঞ্চল প'ড়ে শোনায়—কখনো রেডিও কি রেকর্ড শোনেন, এইভাবেই মোটামুটি তাঁর সময় কাটে। কিন্তু কিছুতেই যেন নিবিষ্ট হ'তে পারেন না, থেকে-থেকে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েন, খানিক পরেই যেন ক্লান্তি আসে। সত্যিকারের কোনো আনন্দই যেন তাঁর জীবনে নেই, একটু পরে সবই বিস্বাদ হ'য়ে পড়ে। চঞ্চলের মনে হয় তাঁর মনের মধ্যে কোনো-একটা গোপন কথা সব সময় ঘুরপাক খাচ্ছে, সে-কথা কাউকে বলতেও পারেন না, অথচ সইতেও পারেন না। এত টাকার মালিক হ'য়েও জীবনে যে তাঁর সুখ নেই, এ-কথা নিঃসন্দেহ।

তৃতীয়ত, এটা চঞ্চল খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখেছে —অটলবাবুর মৃত্যুভয় অসাধারণ। মরবার ভয়ে তিনি যেন আগে থেকেই ম'রে আছেন। রোজ সকালে ডাক্তার আসছে, হার্ট পরীক্ষা করছে; নিচ্ছে ব্লাড-প্রেশার; অকারণে রাশি-রাশি ওষুধ গিলছেন তিনি, বিকেলে নিচ্ছেন মাসাজ, শরীরের সাধারণ অবস্থা ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট করবার জন্য একজন মাইনে-করা নর্সই আছে—মোটের উপর এক তুমুল কাণ্ড, তাছাড়া টাকার যা শ্রাদ্ধ তা আর বলবার নয়।

শুধু এই নয়, যে-কোনোরকম ধারালো কি তীক্ষ্ণ যন্ত্র অটলবাবু তাঁর ধারে-কাছে আসতে দেন না, খাবার ছুরি-কাঁটা, পেনসিল-কাটা ছুরি, কি একটা আলপিন পর্যন্ত নয়। এমন কি, তিনি যে নিবের কলম কি ফাউণ্টেন-পেন কি পেনসিল ব্যবহার করেন না, তারও কারণ ঐরকম ব'লে চঞ্চলের সন্দেহ হয়—ও-সব জিনিসেরও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে যেন তাঁর অবিশ্বাস। এর প্রমাণ প্রথম দিন থেকে চঞ্চল এত বার এত ভাবে পেয়েছে যে, এ-বিষয়ে তার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে ধারালো কি তীক্ষ্ণ জিনিস সম্বন্ধে অটলবাবুর মনে অসম্ভব আতঙ্ক। তিনি যে দাড়ি রেখেছেন—চঞ্চলের দৃঢ় বিশ্বাস—তাও চেহারাটা রবীন্দ্রনাথের মতো করবার জন্য নয়, ক্ষুর ব্যবহার করতে তিনি ভয় পান ব'লে।

এর মধ্যে একদিন নর্স তাঁর নখ কেটে, চুল ছেঁটে দিলে— ও-সব কাজেও সাধারণ নাপিতকে তিনি বিশ্বাস করেন

না, সপ্তাহে একদিন নর্সই নাপিতের কাজ ক'রে দেয়, আর সে-সময়ে অটলবাবু কেমন যেন ঘাবড়ে জবুথবু হ'য়ে যান—অপারেশন করাতে হ'লে লোকের যে-অবস্থা হয়, অনেকটা সেইরকম। ঐ একই কারণে—চঞ্চলের মনে হয়—তিনি সব সময় ও-রকম ভারি-ভারি জামা-কাপড় প'রে থাকেন; মৃত্যু যেন কিরাতের মতো সব সময় তাঁকে শরসন্ধান ক'রে ওৎ পেতে আছে—কখন তীর ছোঁড়ে ঠিক নেই, ভারি কাপড় প'রেও হয়তো সেই তীরকে খানিকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন।

কিন্তু এ-রকম হবার কারণ কী? ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ? চঞ্চল শুনেছে যে কোনো-কোনো লোকের রোগ সম্বন্ধে এমন প্রবল আতঙ্ক থাকে যে সেটাই একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এমনিতে তো তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে তাঁকে মোটেও অপ্রকৃতিস্থ মনে হয় না, ঐ একটা বিষয়ে ছাড়া তিনি সম্পূর্ণই প্রকৃতিস্থ। নাকি, তাঁর জীবনের এমন-কোনো গুপ্ত রহস্য আছে, এমন-কোনো ভয়ানক শত্রু আছে যে তিনি সব সময়ই ভয়ে-ভয়ে থাকেন যে কেউ তাঁকে খুন ক'রে ফেলবে। মানুষের প্রাণ নিতে খুব বেশি কিছু লাগে না, একটা খাবার ছুরি দিয়েও খুন করা যায়। হয়তো সেই-রকমই কোনো আতঙ্ক ভদ্রলোকের জীবন বিষময় ক'রে তুলেছে।

আর-একটা কথা চঞ্চলের প্রায়ই মনে হয়: ভদ্রলোকের

অসুখটা কী? কেন তিনি অত অল্প খান, অত সাবধানে থাকেন? হয়তো কোনো অসুখই নেই, অসুখের আতঙ্কই তাঁকে কাবু ক'রে রেখেছে। যে-ডাক্তারটি রোজ আসেন, তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলবার চেষ্টা সে করেছে, কিন্তু সুবিধে হয়নি। অটলবাবুর নিয়ম-কানুনের কড়াক্কড় খুবঃ ডাক্তার কি নর্স যখন আসবে তখন আর-কেউ ঘরে যেতে পারবে না, চঞ্চল যখন ঘরে থাকে তখনও অন্য-কেউ আসে না—সকলের জন্যই তাঁর সময় ভাগ-ভাগ করা আছে।

একদিন বিকেলের দিকে তিনকড়ি চঞ্চলের ঘরে এসে বললে, 'কর্তা বললেন আপনি যদি বেরোতে চান বেড়িয়ে আসতে পারেন। আপনি মোটেও বেরোন না ব'লে তিনি উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন—হয়তো আপনার কষ্ট হবে।'

'না, না, আমি বেশ আছি। আপনি বসুন না। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

'কী কথা বলুন।'

'আচ্ছা, আপনি কি জানেন অটলবাবুর অসুখটা কী।'

'কী যেন, তা তো জানিনে। তাছাড়া জেনেই বা কী করবো বলুন, বড়োলোকের কত রকমের অসুখ—আমরা তার কী বুঝবো?'

'তবু—কিছু মনে হয় না আপনার? এত ডাক্তার-নর্সের আনাগোনা, জলের মতো পয়সা-খরচ—এর কি কোনো [illegible]ন

নেই? আপনি তো অনেকদিন আছেন—কী মনে হয় আপনার?'

'এ-রকম কিছু-একটা না-হ'লে সংসার চলবে কেমন ক'রে বলুন? অটলবাবুর অগাধ সম্পত্তি, খরচ তো কিছু নেই—ভগবান এ-ভাবেই তাঁর খাজনা আদায় ক'রে নিচ্ছেন।'

'আচ্ছা, উনি কি বরাবরই এ-রকম একা-একা থাকেন?'

'বরাবর থাকবেন কেন—মা-ঠাকরুন যদ্দিন ছিলেন, ঘর-বাড়ি ভরাই ছিলো। আত্মীয়-স্বজনের, বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা ছিলো সব সময়। কিন্তু ঘরের লক্ষ্মীও বিদায় হ'লেন, সঙ্গে-সঙ্গে সবই গেলো। বিশাল পুরী এখন খাঁ-খাঁ করছে। ওঁরও মন-মেজাজ বিশেষ ভালো নেই—লোকজন এলে বিশেষ পছন্দও করেন না, নিজের মনে একা-একাই প'ড়ে আছেন।'

'ওঁর তো ছেলেপুলেও নেই?'

'না, তা থাকলে আর ভাবনা ছিলো কী, বাড়িঘর ভরা থাকতো। কিন্তু এমন কপাল, একটা ছেলে পর্যন্ত হ'লো না। এত ঐশ্বর্য ভোগ করে কে? থাকবার মধ্যে আছেন এক বিধবা বোন, তিনি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে নিয়ে কেষ্টনগরে থাকেন। এই ভাগনিকে উনি খুব ভালোবাসেন।'

'ওঁরা এখানে আসেন না মাঝে-মাঝে?'

'বিশেষ না।' তবে কত্তাই মাঝে-মাঝে যান ভাগনিকে দেখতে। আগে তো খুব ঘন-ঘনই যেতেন। ইদানিং খুব ক'মে এসেছে, বছরে দু'একবারের বেশি দেখাশোনা হয় না।'

'তাই নাকি ?'

'এ আর আশ্চর্য কী বলুন। দু'দিন পরে ভাগনির বিয়ে হ'য়ে যাবে, তখন মামার সঙ্গে বছরে ক'বার দেখা হবে ভেবে দেখুন। লীলার এই ষোলো বছর বয়েস হ'লো, ম্যাট্রিক পাশ করলো এবারে। এখন মেয়েটার বিয়ে হ'য়ে গেলেই কি কত্তার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় ?'

'সে তো বটেই। বিয়ে হচ্ছে বুঝি শিগগিরই।'

'সে-কথা আর বলেন কেন, ওখানেই তো যত গোলমাল,' ব'লে তিনকড়ি হঠাৎ চুপ করলো।

চঞ্চল জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাতেই তিনকড়ি গলা খাটো ক'রে বলতে লাগলো, 'আপনি আজ না হোক কাল সবই জানতে পারবেন—আপনাকে বলতে বাধা নেই। ভাগনির বিয়ে দিতে কত্তার একেবারে মত নেই।'

'তার মানে ?'

'মানে আর কী! তিনি পণ ক'রে বসেছেন লীলার বিয়ে দেবেন না।'

'কোনোদিনই না ?'

'কোনোদিনই না।'

চঞ্চল একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'এমন অদ্ভুত কথা তো কখনো শুনিনি।'

'তবেই বুঝুন! কত্তার এক বাল্যবন্ধু আছেন হরেনবাবু—হাওড়ার মিত্তির ওঁরা, মস্ত ঘর—তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে

লীলার বিয়ে দিতে চান। ছেলেও চমৎকার, রূপে-গুণে কোনো খুঁতই নেই, বি. এ. পাশ ক'রে এম. এ., ল. পড়ছে—যাকে বলে একেবারে ঘরে-বরে সমান। বাপ নেই মেয়েটার—এখানে বিয়ে হ'লে একটা গতি হয়। আপনিই বলুন ঠিক বলছি কিনা।'

এ-রকম একটা ব্যাপারে চঞ্চলের মতামত দেবার কথাই ওঠে না, নেহাৎ ভদ্রতা ক'রেই সে বললে, 'তা তো ঠিকই।'

'ঠিক নয়!' তিনকড়ি উৎসাহিত হ'য়ে বলতে লাগলো, 'এ তো ছেলেমানুষেও বোঝে। এদিকে লীলার মা-ও দাদাকে ঘন-ঘন তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখছেন। অথচ ওঁর ঐ এক অদ্ভুত জেদ—লীলার বিয়ে দেবেন না, কিছুতেই না।'

'এর কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন?'

'কারণ আবার কী? খেয়াল, বড়োমানুষের খেয়াল! হরেনবাবু পাটনায় ওকালতি করেন, তিনি তো সেদিনও লম্বা চিঠি লিখেছেন দেখলুম।'

'আপনি দেখলেন সে-চিঠি?'

'হাঁ, আমি ওঁর বাবার আমলের চাকর—তাই উনি অনেক কথাই আমাকে বলেন। হরেনবাবু কী যে অনুনয়-বিনয় ক'রে লিখেছেন—ছেলের বাপ হ'য়ে কেউ ও-রকম করেন না।'

'আর অটলবাবু?'

'অটলবাবু অটল। কিছুতেই না—এ ছাড়া তাঁর মুখে কথা নেই। হরেনবাবু লিখেছেন শিগগিরই কয়েকদিনের জন্য

কলকাতায় আসবেন—তখন এ-ব্যাপারটা একেবারে পাকা ক'রে যেতে চান।'

চঞ্চল হঠাৎ বললে, 'আচ্ছা, অটলবাবুর কোনো ভাই-টাই নেই?'

'এক ভাই ছিলো, সে মারা গেছে।'

'কী হ'য়ে?'

'তা ঠিক জানিনে—ড্যালহৌসি না আলমোড়া কোথায় গিয়েছিলো বেড়াতে, সেখান থেকে আর ফেরেনি। অটল-বাবুর বড্ড লেগেছিলো। বছর দশেক তো হ'য়ে গেলো, কিন্তু এখনো ভায়ের কথা কেউ বললেই অস্থির হ'য়ে পড়েন।'

'তাহ'লে এই ভাগনিই এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধি-কারিণী?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে। লীলাকেই উনি উইল ক'রে যথা-সর্বস্ব দিয়ে যাবেন, আমরা তো তা-ই জানি।'

'হরেনবাবুর এত বেশি গরজের কারণও বোধ হয় তা-ই?'

তিনকড়ি বললে, 'একথা বললে, অন্যায় হয়। হরেনবাবু অতি সাধু পুরুষ, কর্তার বিশেষ বন্ধু—লীলাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন, এবং তাকেই যে পুত্রবধূ করবেন অনেক আগে থেকেই বোধ হয় মনে-মনে এ-কথা ভেবে রেখেছেন।'

চঞ্চল একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'অটলবাবুর এই অদ্ভুত জেদের একমাত্র কারণ যা হ'তে পারে—'

তিনকড়ি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বললে, 'কী ? কী কারণ আপনার মনে হয় ?'

'পরের ছেলে এত বড়ো সম্পত্তির মালিক হবে তাতেই বোধ হয় তাঁর আপত্তি। তিনি বোধ হয় চান যে তাঁর ভাগনি সারাজীবন অবিবাহিতা থেকে এই সম্পত্তি ভোগ করুক।'

'কিন্তু তার পরে ? সে গত হ'লে ? তখন তো সাত ভূতে লুটে খাবে ?'

চঞ্চল বললে, 'তাও তো বটে। ভদ্রলোকের একটি ছেলে থাকলেই ঠিক হ'তো।'

'সে আর বলতে ! আমি তো তাঁকে অনেকদিন বলেছি—"সদ্বংশের ভালো একটি ছেলেকে পুষ্যি নিন, ঘরে বৌ আসবে, নাতি-নাৎনি হবে, তখন দেখবেন খুবই ভালো লাগবে।" তা এতদিন তো আমার ও-কথায় তিনি মোটে কর্ণপাতই করেননি।'

'এখন কি তাঁর মত বদলেছে ?'

তিনকড়ি খুব নিচু গলায় চুপি-চুপি বললে, 'মনে তো হয়। সেদিন তিনি নিজেই আমাকে ডেকে বললেন, "বুঝলে তিনকড়ি, ভাবছি পোষ্যপুত্রই নেবো।" আমার মনে হয় কী জানেন—' ব'লে তিনকড়ি একটু থামলো।

চঞ্চল কিছু বললে না, তিনকড়ি একেবারে ফিসফিস ক'রে বললে. 'আমার মনে হয় যে আপনাকে দেখে তাঁর এত পছন্দ

হয়েছে যে—যে—তিনি বোধ হয় আপনাকেই পুষ্যি নেবার কথা ভাবছেন।’

চঞ্চল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।—‘অ্যাঁ! বলেন কী!’

‘ও-কথা ব’লেই তিনি আপনার অনেক সুখ্যাতি করলেন। তাইতেই আমার মনে হ’লো—’

‘না—না—এ হ’তেই পারে না, হ’তেই পারে না। এ আপনার একেবারেই ভুল ধারণা।’

‘তা হ’তে পারে।’

এর পর আর বেশিক্ষণ কথাবার্তা চললো না। তিনকড়ি তার নিজের কাজে চ’লে গেলো, আর চঞ্চল একা ঘরে ব’সে আকাশ-পাতাল কত কী ভাবতে লাগলো।



পাঁচ

হরেনবাবুর শিগগিরই আসবার কথা ছিলো, কিন্তু আসা হ'লো না। তিনি চিঠি লিখে জানালেন যে এপ্রিল মাসে ঈস্টরের ছুটিতে আসবেন, এবং তখন বিবাহের প্রস্তাবটা একেবারে পাকা ক'রে যাওয়া তাঁর ইচ্ছা। যাতে বৈশাখেই শুভকর্ম সমাধা হ'তে পারে।

তিনকড়িই চঞ্চলকে এ-খবর জানালে। কিন্তু চঞ্চল কথাটা বিশেষ গ্রাহ্য করলে না—আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে কাজ কী, তার মনের ভাবটা অনেকটা এইরকম। সেদিন তিনকড়ির সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা তার হয়েছিলো সে-সব সে মন থেকে মুছেই ফেলেছিলো; অটলবাবু তাকে পোষ্যপুত্র করতে চান এটা অবশ্য একটা বিরাট ঠাট্টা ছাড়া কিছু নয়, ও-কথা সে মোটে আমলেই আনলে না।

মাস দেড়েক চুপচাপ কেটে গেলো। ইতিমধ্যে চঞ্চল এক মাসের মাইনে পেলো—একসঙ্গে একশো টাকা উপার্জন তার জীবনে এই প্রথম। টাকাটা পেয়েই প্রথমে সে রণজিৎবাবুর ধার শোধ ক'রে দিলে—মাঝে-মাঝে সামন্তমশায়ের বাড়িও সে যায় এবং একদিন কথায়-কথায় তিনকড়ির মুখে যা শুনেছিলো তা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলো।

শুনে রণজিৎবাবু বলেছিলেন, 'বড়োলোকের বাড়িতে

নানারকম গোলমাল থাকেই। তুমি ও-সবের মধ্যে যেয়ো না, চঞ্চল, চুপচাপ নিজের কাজ ক'রে যাও।'

চৈত্রমাস পড়লো। প্রতিদিনই একটু-একটু ক'রে গরম বাড়ছে। অটলবাবুর ঘরে "ঠাণ্ডাই-যন্ত্র" বসানো হয়েছে, কারণ গরম যতই পড়ুক, গা থেকে ও-সব ভারি জামা-কাপড় তিনি ছাড়বেন না। চঞ্চল মনে-মনে ভাবলে যে এ-সব হাঙ্গামা করার চাইতে পাহাড়ে চলে গেলেই তো হয়। কিন্তু— তিনকড়ি তাকে বললে—অটলবাবু নাকি গেলো দশ বছরের মধ্যেও পাহাড়ে যাননি। কলকাতার বাইরেই তিনি খুব কম যান—এই শূন্যপুরীতে কী যে তাঁর ভালো লাগে তিনিই জানেন।

অটলবাবুর মনে কোনো গুপ্তরহস্য কিংবা মাথায় ঈষৎ ছিট হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু চঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একেবারেই নিখুঁত। সম্প্রতি তিনি মাঝে-মাঝে চঞ্চলের সঙ্গে ব'সে-ব'সে অনেকক্ষণ গল্প করেন—তার দেশের খবর, তার মা-বাবার কথা—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এ-সব জিজ্ঞেস করেন। আর চঞ্চল যখন বলে যে তার মা-বাবা নেই, নিকট আত্মীয়ও কেউ নেই, দেশের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই সে সম্পর্ক-ছাড়া, অটলবাবুর মুখের চেহারা যেন কেমন হ'য়ে যায়— তখন চঞ্চলের সন্দেহ হয় যে তিনকড়ি যা বলেছিলো তা হয়তো একেবারে অমূলক নয়। তারপর, 'কলকাতা হরকরা'য় চাকরি নেবার পর থেকে তার জীবনে দু' একটা যা অদ্ভুত

ঘটনা ঘটেছে, তারও গল্প অটলবাবুর কাছে সে করেছে। শুনে তিনি বলেছেন, 'বাঃ, তুমি তো দেখছি বেশ বাহাদুর ছেলে!'

একদিন বিকেলের দিকে চঞ্চল ব'সে-ব'সে অটলবাবুর সঙ্গে ঐরকমই নানা গল্প করছিলো। সেদিন তারা বসেছিলো ঘরের পাশের চওড়া বারান্দায়, হু-হু ক'রে দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছিলো—কলে-ঠাণ্ডা-করা দরজা-জানলা-বন্ধ-করা ঘরের চাইতে এই খোলা হাওয়া অনেক ভালো—অন্তত চঞ্চলের তা-ই মনে হচ্ছিলো।

হঠাৎ অটলবাবু বললেন, 'চঞ্চল, একটা কথা তোমাকে অনেকদিন থেকেই বলবো ভাবছি। বলি-বলি ক'রে বলা হচ্ছে না।'

চঞ্চল সন্ত্রস্ত হ'য়ে বললে, 'বলুন।'

অটলবাবু আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, 'আমার যা অবস্থা দেখছো তো। শরীরের যা হাল, কোন্‌দিন টুপ্‌ ক'রে শুকনো পাতার মতো জীবনের ডাল থেকে ঝ'রে পড়বো! এই বাড়ি খাঁ-খাঁ করবে, রাশি-রাশি টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে পচবে। আমার আপনজনের মধ্যে আছে এক ভাগনি—তাকে অবশ্য অনেক দিয়ে যাবো—কিন্তু তবু অনেক বাকি থাকবে—'

এখানে চঞ্চল আস্তে বললে, 'কেন, তাকেই সব দিয়ে যান না।'

অটলবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'না, তা হয় না। আমি ভাবছি কোনো-একটি বুদ্ধিমান চরিত্রবান ছেলেকে আমার উত্তরাধিকারী করবো। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমাকেই আমি আমার জায়গায় বসিয়ে দিতে চাই। আইনত যা-যা দরকার, তা আগামী সপ্তাহের মধ্যেই করা যেতে পারে।'

এ-কথা শুনে চঞ্চলের মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো, অনেকক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারলে না। যে-কথা একান্তই অবিশ্বাস্য, তাই কি তাকে স্বকর্ণে শুনতে হ'লো? এই বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হওয়া লোভনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো এক ধনীর পোষ্যপুত্র হ'য়ে জীবন কাটানো— এতেও চঞ্চলের মন সায় দিতে পারলে না, কিছুতেই না। এ যেন নিজের সর্বস্ব বিকিয়ে দেয়া।

অটলবাবুই আবার বললেন, 'তোমাকে এক্ষুনি হাঁ-না কিছু বলতে হবে না, তুমি ভেবে ছাখো। দু' চারদিনের মধ্যে আমাকে জানালেই চলবে। আমার দিক থেকে বলতে পারি যে আমার মন স্থির করাই আছে, এখন তুমি রাজি হ'লেই হয়।'

চঞ্চল ঢোঁক গিলে বললে, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

'হ্যাঁ, ভেবে ছাখো। আমার এক বন্ধু আসছেন পাটনা থেকে—কাল এসে পৌঁছবেন—তিনি থাকতে-থাকতেই এ-ব্যাপারটা ঠিক হ'য়ে গেলে ভালো হয়। তিনি উকিল,

আইনের দিকটা ঠিক ক'রে দিতে পারবেন। তিনি দিন-চারেক মাত্র থাকবেন।। বুঝেছো?'

চঞ্চল অন্যমনস্কভাবে ব'লে ফেললো, 'হরেনবাবু কাল আসছেন তাহ'লে?'

অটলবাবু একটু যেন চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ? তুমি তাঁর নাম জানলে কেমন ক'রে?'

চঞ্চল বললে, 'তিনকড়িবাবু বলছিলেন ওঁর কথা।'

'তিনকড়ি বলছিলো? কী বলছিলো সে?'

চঞ্চল আর-একবার ঢোঁক গিলে বললে, 'আপনার একজন বাল্যবন্ধু পাটনা থেকে শিগগিরই আসছেন—এই আরকি।'

'ও, এই! আর-কিছু বলেনি?'

চঞ্চল এ-কথার কী-জবাব দেবে ভাবছিলো এমন সময় অটলবাবু হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'এ কী! হাওয়াটা হঠাৎ প'ড়ে গেলো যে—বড্ড গরম হচ্ছে।'

চঞ্চল বললে, 'হ্যাঁ, বড্ড—'

কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হ'লো না। অটলবাবু আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে তাকিয়ে ভীতস্বরে ব'লে উঠলেন—'দেখেছো! ঝড় আসছে—ঝড়! কী রকম কালো হ'য়ে মেঘ করেছে! ঘরে চলো, শিগগির ঘরে চলো।'

বছরের এ-সময়ে সন্ধের দিকে মাঝে-মাঝে কালবৈশাখী ওঠেই, তা নিয়ে এত ব্যস্ত হবার কী আছে চঞ্চল ভেবে পেলো না। কিন্তু অটলবাবু কথা বলতে-বলতেই উঠে

দাঁড়িয়েছিলেন। যেই তিনি ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, অমনি কড়কড় শব্দে বাজ পড়লো, আর ঘন ধুলোর ঝড় উঠে আকাশের মুখ একেবারে ঢেকে দিলে। চক্ষের পলকে প্রকৃতিতে এই বিপর্যয় শুরু হ'য়ে গেলো।

চঞ্চল তাকিয়ে দেখলে, অটলবাবু দুই কানে হাত চেপে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ একদম শাদা হ'য়ে গেছে। তাঁর কাছে গিয়ে সে বললে, 'চলুন, ঘরে চলুন, এখানে আর বসা যাবে না।'

আস্তে-আস্তে পা ফেলে অটলবাবু ঘরে এলেন, এসেই তাঁর ইজি-চেয়ারটিতে আশ্রয় নিলেন। খানিকক্ষণ চোখ বুজে তিনি চুপ ক'রে প'ড়ে রইলেন, তাঁর নিঃশ্বাস জোরে-জোরে ওঠা-পড়া করতে লাগলো।

চঞ্চল মৃদুস্বরে জবাব দিলে, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? ডাক্তারকে খবর দেবো?'

'না, না, ঠিক আছি, ঠিক হ'য়ে গেছে।'

'আপনার কী হয়েছিলো? হঠাৎ যেন...'

অটলবাবু বললেন, 'ও কিছু না। ঝড়-টড় আমার মোটে ভালো লাগে না—এই আরকি। আর ঐ বাজের শব্দটা...' শব্দটা স্মরণ ক'রেও তিনি যেন একবার শিউরে উঠলেন।

'ও-রকম আবার হবে না তো? বাজের শব্দ আপনার খুব খারাপ লাগে বুঝি?'

'খারাপ মানে? অসহ্য লাগে। মনে হয় যেন আমার বুক ফুঁড়ে কী-একটা চ'লে গেলো। উঃ!'

'আজকালকার ঝড় বেশিক্ষণ থাকে না, এক্ষুনি ক'মে যাবে। আবার বাইরে যাবেন, না এখানেই…'

'না, না, আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই। তুমি এক কাজ করো তো, আলোটা জ্বালো, তারপর আমাকে একটা বই-টই প'ড়ে শোনাও। একটা হাসির গল্প-টল্প কিছু। সত্যি, কী বিশ্রী আওয়াজ, এখনো আমার বুকটা ঢিপঢিপ করছে।'

চঞ্চল আর-কিছু বললে না। আলো জেলে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্য-কৌতুক' প'ড়ে শোনাতে লাগলো।



ছয়

পরের দিন সকালে হরেনবাবু এলেন। রোগা, লম্বা, মাথায় টাক, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। দেখে খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির মানুষ মনে হয়। তাঁর অভ্যর্থনা দেখাশোনা ইত্যাদির অনেকখানি চঞ্চলকেই করতে হ-লো। তাকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবার এ-বাড়িতে কবে থেকে ?'

'এই তো অল্পদিন।'

'কী-নাম তোমার ?'

'চঞ্চল নাগ।'

'কী-কাজ করো ?'

তিনকড়ি বুঝিয়ে বললেন যে ইনি বাবুর নতুন সেক্রেটারি।

'সেক্রেটারি! হোঃ—আবার সেক্রেটারিও বহাল করা হয়েছে! বেশ, বেশ। লোকে কত ভাবেই যে পয়সা ওড়ায়! তা বেশ ভালোই আছো তোমরা, অটলকে বেশ শুষে খাচ্ছো তো ?'

ভদ্রলোকের চাল-চলন কথাবার্তা চঞ্চলের একটুও ভালো লাগলো না। কেমন একটা অমার্জিত রূঢ়তা তাঁর প্রত্যেক কথায় যেন ফুটে ওঠে। আর বন্ধুর সম্পত্তির প্রতি তাঁর দরদটা যেন বড়োই বেশি।

স্নান ও চা-পানের পরে হরেনবাবু সেই যে অটলবাবুর ঘরে ঢুকলেন, বেরোলেন দু' ঘণ্টা পরে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এতক্ষণ তাঁরা কী-কথা বললেন তাঁরাই জানেন।

তিনকড়ি চঞ্চলকে নিভৃতে বললে, 'হরেন মিত্তির শক্ত লোক, ঘাগি উকিল। কর্তাকে রাজি না-করিয়ে ছাড়বে ব'লে মনে হয় না।'

চঞ্চল বললে, 'ভদ্রলোককে আমার কিন্তু বিশেষ ভালো লাগলো না।'

'হরেনবাবুর মুখটা কিছু ঢিলে, নয়তো লোক কিছু খারাপ নন। আমাদের কত্তার ওঁর প্রস্তাবে রাজি হওয়াই উচিত।'

চঞ্চলের মনে পড়লো তাকে পুষ্যি নেবার কথা অটলবাবু নিজের মুখে বলেছেন। মনে পড়লো শিগগিরই তাকে এ-বিষয়ে মন স্থির করতে হবে। একবার ভাবলে, তিনকড়িকে কথাটা বলে, কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে হ'লো, থাক, ব'লে কাজ নেই। রণজিৎবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু কথাটা এতই আজগুবি যে কাউকে বলতেও লজ্জা করে। থাক, দেখা যাক কী হয়। চঞ্চলের এমনও আশা হ'লো যে ঝোঁকের মাথায় কথাটা ব'লে ফেলে অটলবাবু হয়তো ভুলে'ও যাবেন।

কিন্তু তিনি যে ভোলেননি তার প্রমাণ পাওয়া গেলো পরের দিন সকালেই, যখন চঞ্চলকে ডেকে তিনি বললেন, 'কী হে, ও-বিষয়ে মন স্থির করতে পারলে ?'

চঞ্চল কাতর স্বরে বললে, 'আজ্ঞে আর দুটো দিন সময় দিন।'

'কেন, এত তোমার ভাববার কী আছে বলো তো? আজ সন্ধের মধ্যে তোমার জবাব চাই—বুঝলে? যদি তোমার মত না হয়, সে-কথাই স্পষ্ট ক'রে বলবে, আমি একটুও রাগ করবো না।'

চঞ্চল বললে, 'আচ্ছা।'

'আর শোনো—যদি তোমার মনে কোনোরকম দ্বিধা কি সংশয় থাকে, আমার সঙ্গে সে-বিষয়ে মন খুলে আলাপ করতে পারো। আমি তো তোমার আপত্তি হবার কোনো কারণ দেখিনে। এতে তোমার স্বাধীনতা কিচ্ছু নষ্ট হবে না, বরং নিজের জীবনটা যেমনভাবে খুশি চালাতে পারবে—পয়সার অভাবে পদে-পদে ধাক্কা খেতে হবে না। এদিকে আমি এটুকু জানবো যে আমার অবর্তমানে এত বিষয়-সম্পত্তি ছারখারে যাবে না। তোমার সঙ্গে আমার চেনা অল্পদিনেরই, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ও সততার উপর আমার বিশ্বাস জ'ন্মে গেছে, তুমি এ-সমস্তর ভার নিলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারবো।'

শেষের দিকে অটলবাবুর কণ্ঠস্বর করুণ হ'য়ে উঠলো।

'অবশ্য আমার পুত্র ব'লে তোমাকে পরিচয় দিতে হবে, আমার নাম তোমাকে গ্রহণ করতে হবে—সেটা হয়তো তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু তাতে তোমার এমন-কী

ক্ষতি? তোমার নিজের মা-বাবা নেই, ভাই-বোনও নেই, কাজেই কারো মনে কষ্ট দিয়ে তোমাকে এ-কাজ করতে হবে না। আমি আর ক'দিন—ওপারে যাবার জন্য তো পা বাড়িয়েই আছি—তারপর সবই তোমার হাতে। এতে তোমার লাভ বই ক্ষতি নেই, এদিকে আমার যে কত বড়ো উপকার তা তুমি বুঝবে না। আমার এটুকু উপকার কি তুমি করবে না?…কী, কিছু বলছো না যে?'

'আজ সন্ধেবেলা আপনাকে নিশ্চয়ই জানাবো,' ব'লে চঞ্চল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এ এক মহা সমস্যাতেই সে পড়েছে! পোষ্যপুত্র হবার কথা কল্পনা করতেও তার কী যে খারাপ লাগে, তা বলবার নয়। প্রথমে তার ঝোঁক হ'লো স্পষ্ট 'না' ব'লে দেবে—তার ফলে যা হবার হবে। বড়ো জোর এই চাকরিটি যাবে, তার চেয়ে খারাপ তো আর কিছু হবে না। কিন্তু আস্তে-আস্তে অন্য নানা কথা তার মনে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো। এই বিরাট সম্পত্তির মালিক হবে—সে-কথা তো আছেই। তাছাড়া এ-ক'দিনে এই প্রকাণ্ড, অলস, অসহায়, ভালোমানুষ লোকটির উপর তার কেমন একটু মমতাও জ'ন্মে গেছে। তিনি অত ক'রে বলছেন, 'না' বললে মনে কষ্ট পাবেন—এ-কথা ভাবতে চঞ্চলের নিজের মনেই যেন কষ্ট হয়। আবার যখনই ভাবে নিজের সমস্ত পরিচয় মুছে ফেলে', নিজের নাম পর্যন্ত বদল ক'রে হঠাৎ শোভাবাজারের দত্তদের বিপুল বিত্তের অধিকারী

হ'য়ে বসতে হবে, তখনই তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। সে হাবা নয়, অক্ষম নয়, অলস নয়, পরিশ্রমে তার আপত্তি নেই, যে-কোনো অবস্থায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার মতো অর্থোপার্জন সে করতে পারবেই, হয়তো কোনোদিন নিজের চেষ্টায় ভাগ্যের মোড়ও ফেরাতে পারবে—পুরুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো সার্থকতা আর-কী হ'তে পারে? জীবন-সংগ্রাম ব'লে যদি কিছু না থাকে, তাহ'লে জীবন থেকে সমস্ত স্বাদই চ'লে যায় যেন।

চঞ্চল কিছুতেই মন স্থির করতে পারে না।

*　　*　　*　　*

বিকেলবেলা পাঁচটার কিছু পরে, চঞ্চল তার ঘরে ব'সে চা খাচ্ছে এমন সময় ইলেকট্রিক বেলটি বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে সে অটলবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলো সেখানে হরেনবাবু ব'সে আছেন। তাকে দেখেই মুখে একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি এনে হরেনবাবু বললেন, 'আসুন সেক্রেটারি-সাহেব! আমরা আপনারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছি।'

চঞ্চল কিছু বিস্মিত হ'য়ে অটলবাবুর মুখের দিকে তাকালো। তিনি শান্তভাবে বললেন, 'সকালে তোমার সঙ্গে যে-বিষয়ে কথা হচ্ছিলো, সে-বিষয়ে তুমি মন স্থির করতে পেরেছো কি?'

হরেনবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'চটপট মনের কথাটা ব'লে ফ্যালো—দেরি কোরো না।'

ভদ্রলোকের কথা বলবার ধরনে এমন একটা বিশ্রীরকমের ঝাঁজ ছিলো যে চঞ্চলের মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে এলো। কী বলছে তা যেন ভালো ক'রে না বুঝেই অটলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'আপনার যা ইচ্ছে তা-ই হবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে হরেনবাবুর মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। টেবিলের উপর থেকে অটলবাবু মস্ত মোটা একটা চুরুট তুলে নিয়ে নিজের পকেট থেকে তিনি বড়োরকম একটা ছুরি বের করলেন। তারপর ছুরি দিয়ে আস্তে-আস্তে চুরুটের একটা মুখ কেটে নিয়ে সেটা মুখে তুলে ধরালেন। এ-কাজগুলো করতে সব সুদ্ধ তাঁর প্রায় পাঁচ মিনিট লাগলো।

অটলবাবু এতক্ষণ নিঃশব্দে তাঁর বন্ধুকে লক্ষ্য করছিলেন, এইবারে বললেন, 'হরেন, ও-জিনিসটা সব সময় তোমার পকেটেই থাকে নাকি?'

'কোন্‌টা? এটা?' ছুরির ঝকঝকে ফলাটা ঠিক নাকের সামনে ধ'রে হরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এটা আমার পকেটেই থাকে।'

'কেন, ও-রকম একটা বিদঘুটে যন্ত্র পকেটে নিয়ে বেড়াও কেন?'

'ছেলেবেলাকার অভ্যেস এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি বোধহয়। তা এটা কাজেও লাগে নানারকম,' বলতে-বলতে হরেনবাবু খোলা ছুরিটা হাতের তেলোর উপর নাচাতে লাগলেন।

ও-রকম কোরো না, হরেন,' ব'লে উঠলেন অটলবাবু। 'আমার গা কেমন শিরশির করে।'

হরেনবাবুর মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠলো। আস্তে বললেন, 'সেইজন্যই তো ও-রকম করছি।' কিন্তু তার পরেই চকচকে ছুরিটা টেবিলে চুরুটের বাক্সের উপর রেখে দিয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ—তোমার সঙ্গে কথাটা তাহ'লে শেষ ক'রে ফেলি।'

অটলবাবু বললেন, 'চঞ্চল, তুমি তাহ'লে এখন—'

হরেনবাবুর হাব-ভাব চঞ্চলের মোটে ভালো লাগছিলো না, এঁদের দু'জনের কথাবার্তায় উপস্থিত থাকতে পারলেই সে খুশি হ'তো। কিন্তু কর্তার আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে যেতে হ'লো।

সে যখন দরজার কাছে, অটলবাবু আবার তাকে ডেকে বললেন, 'শোনো, চঞ্চল, আবার তোমাকে দরকার হ'তে পারে। বাড়িতেই থেকো।'

চঞ্চল অনুমতি না-নিয়ে কখনোই বেরোয় না, সুতরাং এ-কথা বলাই বাহুল্য। তবু সে যেতে-যেতে বললে, 'হ্যাঁ, থাকবো।'

ঘরের বাইরে এসেই সে শুনলে, হরেনবাবু ক্রুদ্ধ উগ্রস্বরে বলছেন, 'অটল, তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে?'

অটলবাবুও গলা চড়িয়ে (তাঁর পক্ষে যেটা খুবই অস্বাভাবিক) বললেন, 'নিজের চরকায় তেল দাও, হরেন, আমাকে ঘাঁটাতে এসো না।'

কাল-বৈশাখীর ঝড়—



"দেখেছো !···কী রকম কালো হ'য়ে মেঘ করেছে !"

পৃঃ—৩২

হরেনবাবু বললেন, 'ছেলের বাপ হ'য়ে তোমাকে এত খোশামোদ করছি, এত হীনতা স্বীকার করছি তোমার কাছে, আর তুমি কিনা—তুমি কিনা—'

রাগে হরেনবাবুর কথা শেষ হ'লো না। অটলবাবু বললেন, 'আমি আমার ভাগনির বিয়ে দেবো না, এর উপরে আর কথা কী! তুমি আমাকে আর জ্বালিয়ো না।'

'কী! এত বড়ো কথা! আচ্ছা, এ-অপমানের প্রতিশোধ আমি যদি না নিয়েছি—' বাকি কথাগুলো শোনা গেলো না।

চঞ্চলের ইচ্ছে হ'লো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আরো কিছু শোনে, কিন্তু দরজায় আড়ি পাতা নিতান্তই গর্হিত কাজ, কিছুতেই সে তা পেরে উঠলো না। বিরস মনে নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

সাত

ঘরে এসে চঞ্চল দেখলো তার টেবিলের উপর একখানা চিঠি প'ড়ে আছে। খামের উপরকার লেখা তার সম্পূর্ণ অচেনা। চিঠি খুলে তাড়াতাড়ি নিচের দিকে তাকালো—চিঠিখানা লিখেছেন হরেনবাবু।

> 'তুমি একটি গর্দভ। অটলের যে মাথা-খারাপ, তা কি তুমি এখনো বোঝোনি? ওর প্রস্তাবে যদি রাজি হও তাতে তোমার তো ভালো হবেই না, অটলেরও তাতে মহা ক্ষতি। আজ রাত্তিরে খাওয়ার পর আমার ঘরে এসো, আমি সব কথা বুঝিয়ে বলবো। ইতি
>
> হরেন্দ্রকুমার মিত্র'

চিঠিখানা চঞ্চল একবার, দু'বার, তিনবার পড়লো, তারপর তার টেবিলের সঙ্গে লাগানো বেল টিপলো।

তারা ঘরে ঢুকতেই সে জিজ্ঞেস করলে, 'এ-চিঠি কখন এলো?'

'আপনি কত্তার ঘরে গেছেন, তার একটু পরেই।'

'কে দিয়ে গেলো?'

'হরিপদ।'

'ডাকো তাকে।'

মিনিট পাঁচেক পরে হরিপদ এলো। দোতলার ঘরগুলো

পরিষ্কার রাখা তার কাজ, না-ডাকলে সে তেতলায় আসেই না। হরেনবাবুকে থাকতে দেওয়া হয়েছে দোতলার একটি ঘরে, তাঁর দেখাশোনা হরিপদই করছে।

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলে, 'এ-চিঠি তুমি নিয়ে এসেছিলে ?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'হরেনবাবু তোমাকে কখন দিয়েছিলেন এ-চিঠি ?'

'আজ্ঞে তিনি তেতলায় আসবার আগেই আমাকে চিঠিখানা দিয়ে বলেছিলেন—"চঞ্চলবাবুর ঘরে দিয়ে এসো"।'

'তুমি দিতে একটু দেরি করেছিলে—না ?'

'আজ্ঞে, বাবু আমাকে কয়েকটা ডাকে দেবার চিঠিও দিয়েছিলেন, সেগুলো ডাকঘরে ছেড়ে দিয়ে এসে তারপর আমি এখানা নিয়ে এলুম।'

'আচ্ছা, বেশ। তুমি যাও।'

চিঠিখানা সামনে নিয়ে চঞ্চল গুম হ'য়ে ব'সে রইলো। সন্ধে হয়-হয়, কিন্তু চঞ্চলের মনে হ'লো সন্ধে হবার আগেই যেন চারদিক অন্ধকার হ'য়ে আসছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো আকাশ থমথমে হ'য়ে আসছে, গাছের পাতা নড়ে না, এক্ষুনি কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে।

সেদিন একটু ঝড়ের আভাসেই অটলবাবু কেমন বিচলিত হয়েছিলেন সে-কথা মনে প'ড়ে চঞ্চল উদ্বিগ্ন বোধ করলো। তার ইচ্ছে হ'লো এখনি আবার অটলবাবুর ঘরে যায়, কিন্তু তাকে ডেকে না-পাঠালে ও-ঘরে যাবার অনুমতি তার নেই।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করলো হঠাৎ গাছের পাতাগুলো আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো, ধুলোর ঝড় উঠলো রাস্তায়, সমস্ত আকাশে একটা মরা হলদে আলো ছড়িয়ে পড়লো। জানলার শার্সি বন্ধ ক'রে দিয়ে সে স'রে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই মুহূর্তে অটলবাবুর ঘর থেকে একটা রক্ত-হিম-করা চীৎকার সে শুনতে পেলো—'মেরে ফেললো, খুন ক'রে ফেললো—বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও!' সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ শব্দে একটা বাজ পড়লো, চারদিক এলো অন্ধকার হ'য়ে।

দু'এক মিনিট চঞ্চল যেন একেবারে বিমূঢ় অবস্থায় স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। তারপর হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে এলো, সে ছুটে গেলো অটলবাবুর ঘরের দিকে।

ঘরের দরজার ধারে হরেনবাবুর সঙ্গে তার মাথা প্রায় ঠুকে গেলো। হরেনবাবু তার হাত ধ'রে বললেন, 'কী হে, এত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটেছো কোথায়?'

চঞ্চল হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'আপনি শোনেননি কিছু—কোনো চীৎকার—?'

হরেনবাবু বললেন, 'না তো! আমি এইমাত্র এলুম।'

'আপনি কি মাঝে নিচে গিয়েছিলেন?'

'হাঁ, এইমাত্র ফিরে আসছি।'

'একটা ভয়ানক চীৎকার শুনলুম—হাত ছাড়ুন আমার—'

'চীৎকার আবার কোত্থেকে শুনলে? তুমিও কি পাগল হ'লে? শোনো—তোমার সঙ্গে কথা আছে—'

'এখন আমার সময় নেই,' ব'লে চঞ্চল এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরের মধ্যে রাতের মত অন্ধকার, হঠাৎ ঢুকে কিছুই ঠাহর হয় না। কিন্তু তারই মধ্যে চঞ্চলের চোখে পড়লো যে অটলবাবু তালগোল পাকিয়ে মেঝের উপর প'ড়ে আছেন আর তাঁর পাশেই গোল ছাঁদের সেণ্টার-টেবিলটি উল্টিয়ে প'ড়ে আছে।

চঞ্চলের পিছনে দাঁড়িয়ে হরেনবাবু বললেন, 'আলোটা জ্বালো।'

চঞ্চল দেয়ালে নির্দিষ্ট জায়গায় একটার পর একটা সুইচ টিপলে, কিন্তু আলো জ্বললো না।

হরেনবাবু বললেন, 'লাইন খারাপ হ'য়ে গেছে বোধ হয়। টর্চ আছে?'

কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেকগুলো টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে তিনকড়ি, আর তার সঙ্গে বাড়ির সমস্ত চাকর সে-ঘরে এসে জড়ো হ'লো।

অটলবাবুর দেহ স্থির, নিঃস্পন্দ, তাতে প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই। উবু হ'য়ে হাঁটু-ভাঙা অবস্থায় তিনি প'ড়ে আছেন, আর তাঁর ঘাড়ের উপর কানের ঠিক তলায় ছোটো একটা ক্ষত, তা দিয়ে রক্ত প'ড়ে-প'ড়ে

তাঁর গায়ের কাপড় তো লাল হয়েইছে, মেঝের কার্পেটের একটা সবুজ ফুলও পলাশের মতো রঙিন হ'য়ে উঠেছে। আর তিনি যেখানে প'ড়ে আছেন, তার পাশেই প'ড়ে আছে হরেনবাবুর সেই ছুরিটি—ডাঁটের উপর তাঁর নামের আদ্যক্ষর H. M. খোদাই করা।

হরেনবাবুর মুখ কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো। তিনি ভাঙা গলায় ফিসফিস ক'রে বললেন, 'চঞ্চল, ভালো ক'রে ছাখো তো—কিছু বোধ হয় হয়নি—বোধ হয় ফিট হ'য়ে পড়েছেন।'

চঞ্চল কঠিন কণ্ঠে বললে, 'ফিট হ'লে কি ও-রকম রক্ত বেরোয়?'

'রক্ত, কই আমি তো—'

চঞ্চল একটা জোরালো টর্চ ফেলে বললে, 'দেখুন।'

হরেনবাবু আগে বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেননি, সেদিকে চোখ পড়তেই তাঁর গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তস্বর বেরলো।—'তাই তো! এ কী! এ কেমন ক'রে হ'লো?'

ব'লে তিনি নিচু হ'য়ে বোধ হয় ছুরিটাই কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, চঞ্চল গর্জন ক'রে উঠলো—'খবরদার! কোনো জিনিসে হাত দেবেন না। ডাক্তার আর পুলিশ এসে যা করবার করবে। চুপ ক'রে ওখানে ব'সে থাকুন, নড়েছেন তো রক্ষে নেই।'

হরেনবাবুর চোখে-মুখে যে ভীত ভাব ফুটে উঠলো তা

বলবার নয়। এমন নির্জীব ভঙ্গিতে তিনি সোফার উপর ব'সে পড়লেন যেন তাঁর দেহ থেকে সমস্ত শক্তি চ'লে গিয়েছে।

হঠাৎ ঘরের সমস্ত আলো একসঙ্গে জ্ব'লে উঠলো।

'বাঃ' চঞ্চল ব'লে উঠলো, 'কারেন্ট ফিরে এসেছে দেখছি! বোধ হয় ঝড়ের জন্য কিছু গোলমাল হয়েছিলো।'

উজ্জ্বল আলোয় এই লোমহর্ষক দুর্ঘটনার পরিষ্কার ছবি সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠলো। অটলবাবু নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয় ইজিচেয়ারটিতেই ব'সে ছিলেন, আততায়ী পিছন থেকে তাঁর ঘাড়ে হঠাৎ ছুরি বিঁধিয়ে দেয়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চীৎকার ক'রে ওঠেন। সামান্য ধ্বস্তাধ্বস্তিও হয়তো হয়েছিলো যাতে গোল সেণ্টার-টেবিলটি উ'ল্টিয়ে যায়। টেবিলের উপর ছাইদান আর চুরুটের বাক্স ছিলো— ছাইদানটি কাৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে, আর চুরুটগুলি সারা মেঝেতে ছিটানো। তারপরেই অটলবাবু মেঝেতে প'ড়ে যান এবং মৃত্যু এসে তাঁর সব যন্ত্রণা হরণ করতে দেরি করেনি। ছুরির আঘাত আকারে ছোটো হ'লেও নিশ্চয়ই খুব প্রাণান্তকর জায়গায় লেগেছিলো, হয়তো এমন-কোনো নাড়ি কেটে গেছে যার পরে মানুষ আর বাঁচতে পারে না।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কে যেন যন্ত্রসহযোগে গান গেয়ে উঠলো! চঞ্চল এত চমকে উঠলো যে আর-একটু হ'লে চেঁচিয়েই উঠতো। কিন্তু একটু পরেই সে বুঝতে পারলো

যে গানটা আসছে রেডিও থেকে। রেডিওটা বোধ হয় খোলাই ছিলো—অটলবাবু সন্ধেবেলা গান-বাজনা শুনতে ভালোবাসতেন।

চঞ্চল রেডিওটা বন্ধ ক'রে দিলে, তারপর দুটো টেলিফোন করলে, একটা ডাক্তারকে, আর-একটা রণজিৎবাবুকে।

আট

দিন সাতেক পরে চঞ্চল আর রণজিৎবাবু একদিন হাজতে হরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলো। এ-ক'দিনেই ভদ্রলোকের চেহারা ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গেছে, চোখ গেছে ব'সে, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, গলা দিয়ে ভালো ক'রে আওয়াজ বেরোয় না। পুলিশ তাঁকে 'বেইল' পর্যন্ত দেয়নি, গ্রেপ্তার ক'রেই একেবারে হাজতে নিয়ে পুরেছে।

রণজিৎবাবু বললেন, 'হরেনবাবু, আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করুন, তাহ'লে কোর্টের হয়তো দয়া হ'তে পারে।'

'আমি তো আপনাদের কাছে অনেকবারই বলেছি যে আমি ও-কাজ করিনি, ও-বিষয়ে আমি কিছুই জানিনে।'

'আপনি ছাড়া আর কে করবে, বলুন।'

'তা আমি কেমন ক'রে বলবো? কিন্তু আমি যে করিনি তা শপথ ক'রে বলতে পারি।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনি যে এ-কাজ করেছেন তার এত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আপনার বাঁচবার কোনো উপায়ই নেই। আপনি নিজে একজন বড়ো উকিল, এ-বিষয়ে আপনাকে বেশি বলা বৃথা। তবে যদি অপরাধ স্বীকার করেন এবং কোর্টের দয়া প্রার্থনা করেন, তাহ'লে হয়তো ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর হ'তে পারে।'

হরেনবাবু শিউরে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তবু আপনি স্বীকার করবেন না?'

হরেনবাবু ক্লান্তস্বরে বললেন, 'এক কথা আর কতবার বলবো?'

রণজিৎবাবু বললেন, 'আগামী সোমবার কেস কোর্টে উঠবে। আজ বেস্পতিবার, এ ক'দিন ভাববার সময় পেলেন। দেখুন, এর মধ্যে যদি মত বদল হয়।'

যাবার আগে চঞ্চল হরেনবাবুকে বললে, 'আপনার আত্মীয়রা আপনার পক্ষে উকিল লাগিয়েছেন,' তিনি কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।'

'উকিল দিয়ে আর কী হবে?'

'কেন, আপনি কি কেস ডিফেণ্ড করবেন না?'

'কী হবে ডিফেণ্ড ক'রে? অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া তো উপায় দেখিনে।'

'তার মানে—আপনি ঠিকই ও-কাজ করেছেন?'

'তার মানে—ও-কাজ আমি করিনি; কিন্তু যদি বলি করেছি, তাহ'লে হয়তো ফাঁসি না হ'য়ে দ্বীপান্তর হবে। দ্বীপান্তর—উঃ!' হরেনবাবু দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

বাইরে এসে রণজিৎবাবু বললেন, 'লোকটা একটা স্কাউণ্ড্রেল!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে মানে! তোমার মনে কি এখনো সন্দেহ আছে?'

'আমার মনে নানারকম সন্দেহই হচ্ছে।'

'কী-রকম ?'

চঞ্চল সে-কথার জবাব না-দিয়ে বললে, 'আপনি এখন কোন্‌দিকে যাবেন ?'

'আমাকে একটু লালবাজার যেতে হবে। তুমি ?'

'আমি একবার অটলবাবুর বাড়ি যাবো।'

'কেন, ওখানে আবার কী দরকার ?'

'আমার দু' একটা জিনিস ফেলে এসেছি। সন্ধের আগেই যাবো আপনার ওখানে।' (ঐ হত্যাকাণ্ডের পরে চঞ্চল আবার রণজিৎবাবুর বাড়িতেই এসে উঠেছে, এবং এ-ক'দিন সেখানেই আছে।)

রণজিৎবাবু বললেন, 'আমার গাড়িতেই এসো, তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাই।'

গাড়িতে উঠে চঞ্চল বললে, 'হরেনবাবুর পক্ষে শুধু একটা কথা আছে।'

'কী সেটা ?'

'পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট। ওরা বলছে—Death due to heart-failure.'

'কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বলছে যে ছুরির আঘাতে ঘাড়ের একটা নাড়ি কেটে গিয়েছিলো। তারপর যে রক্তপাত আরম্ভ হয় তার জন্যই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুমি এ নিয়ে এত ভাবছো কেন বলো তো ?

হরেন মিত্তিরকে বাঁচাবার কোনো উপায়ই নেই। আর ও-রকম সাংঘাতিক লোক—যে তার বাল্যবন্ধুকে অর্থের লোভে অনায়াসে হত্যা করতে পারলো—তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করাও অন্যায়।'

'সে তো ঠিক কথাই। তবে কিনা—

'তবে কিনা?'

'আমার সাক্ষীর উপরেই তো সমস্ত কেস নির্ভর করছে।'

'তা তো করছেই।'

'সেইজন্যেই আমার মনটা যেন কেমন লাগছে। আমার মুখের কথার ফলে একটা লোকের ফাঁসি হ'য়ে যাবে!'

রণজিৎবাবু বললেন, 'চঞ্চল, তুমি এখনো ছেলেমানুষ আছো।'

চঞ্চল বললে, 'তা তো আছিই।'

অটলবাবুর বাড়ি এসেই চঞ্চলের সঙ্গে তিনকড়ির দেখা। তিনকড়ি জিজ্ঞেস করলে, 'কী খবর, চঞ্চলবাবু?'

'খবর কিছুই নেই। আপনারা কেমন আছেন তাই দেখতে এলুম।'

'কেমন আর আছি! নেই বললেই চলে। যা সর্বনাশ হ'য়ে গেলো, এর পরে আর আমাদের থাকা! এই রাজপ্রাসাদ, এত ঐশ্বর্য—কী হবে এ-সব এখন? কত্তার জ্যাঠতুতো ভায়ের ছেলেরা তো এর মধ্যেই এসে দাবি জানিয়ে গেছে—এই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তারাই নাকি উত্তরাধিকারী!'

তিনকড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'তা ওরা যদি আইনত উত্তরাধিকারী হয় তো ওরাই পাবে—এ নিয়ে মন খারাপ করা বৃথা।'

'কিন্তু তা তো হ'তে পারে না—কত্তার বোন আছেন, ভাগনি আছে, তাদের কি কোনোই দাবি নেই?'

'আইনত নেই হয়তো।'

'আমার মনে হয় কী জানেন? কত্তার ভাইপোরাই খুনে হরেনের পক্ষে উকিল লাগিয়েছে—বোধ হয় প্রমাণ করতে চাইবে যে অটলবাবুর মাথা খারাপ ছিলো, এবং পাগলামির ঝোঁকে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।'

'তাতে হরেনবাবু বাঁচতে পারেন, কিন্তু ওদের লাভ কী?'

'লাভ এই যে কত্তার উইল-টুইল যদি কিছু বেরোয়, সেগুলো নাকচ ক'রে দেয়া যায়। ওরা ভয়ানক ধূর্ত লোক, কোনো আইনের প্যাঁচ কষে লীলাকে ঠকাবার মতলবেই আছে বোধহয়।'

'কাগজপত্র কিছু বেরিয়েছে নাকি?'

'তা বেরোয়নি, তবে এমন কতকগুলো কাগজ পেয়েছি, যাতে—'

চঞ্চল উৎসুক স্বরে বললে, 'কী কাগজ? দেখি।'

তিনকড়ি টেবিলের দেরাজ থেকে দু'খানা হাতে লেখা কাগজ বের করলে। একটা চঞ্চলকে পোষ্যপুত্র নেবার দলিল, আর একখানা অটলবাবুর উইল, তাতে তাঁর ভাগনিকে দেওঘরের বাড়ি আর যাবজ্জীবন মাসে পাঁচশো টাকা মাসহারা

দেয়া হয়েছে—এই সর্তে যে সে কোনোদিন বিয়ে করবে না। বিয়ে করলে মামার সম্পত্তি থেকে এক পয়সাও সে পাবে না।

কাগজ দুটো অবশ্য পাকা দলিল নয়, খসড়া মাত্র, সই-টই কারুরই নেই।

চঞ্চল বললে, 'হাতের লেখাটা হরেনবাবুরই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাঁরই লেখা। তিনি যে ঘরে ছিলেন, তার বিছানার তলা থেকেই কাগজ দুটো বেরিয়েছে।'

'এ তো বড় আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কাকে বলছেন?'

'এই খসড়া দুটো করতে হরেনবাবু যে রাজি হয়েছিলেন তা কি আশ্চর্য নয়?'

'এ আর আশ্চর্য কী, বলুন। ঐ খসড়া দুটো যাতে দলিল হ'য়ে না উঠতে পারে, সেইজন্যই তো এমন একটা পৈশাচিক কাণ্ড তিনি করলেন। লোকটা এত বড়ো শয়তান, তা কে জানতো!'

চঞ্চল বললে, 'চলুন একটু কত্তার ঘরে যাওয়া যাক, চাবি-গুলো সব নিয়ে চলুন।'

'আর ও-ঘরে গিয়ে কী করবেন?'

'চলুন একটু খুঁজে-খুঁজে দেখি আর-কোনো তথ্য উদ্ধার হয় কিনা।'

তিনকড়ির সাহায্যে অটলবাবুর সমস্ত দেরাজ বাক্স-টাক্স খুলে চঞ্চল কাগজের স্তূপের মধ্যে ডুবে গেলো। আট ঘণ্টা সময় কেমন ক'রে কেটে গেলো সে টেরও পেলো না। রণজিৎ-বাবুর বাড়ি ফিরতে রাত দশটা হ'য়ে গেলো তার।

নয়

আজ সোমবার। বেলা দশটা থেকেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সামনে ছোটোখাটো একটি ভিড় জমেছে। খুনের মামলা হ'লেই লোকের কৌতূহল হয়—তার উপর খুন হয়েছেন কলকাতার একজন নামজাদা ধনী, আর খুন করেছেন তাঁরই বাল্যবন্ধু, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন বিখ্যাত উকিল—তাই এ-মামলা শোনবার জন্যেও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেকে এসেছেন। তাছাড়া বেকার, উকিল ও খবরের কাগজের লোক তো আছেই।

কোর্ট বসলো। আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন হরেন মিত্তির। রণজিৎবাবু তাঁর সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত, সাক্ষীরা এক ধারে ব'সে অপেক্ষা করছেন। পাব্লিক প্রসিকিউটর কেসটি আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন ঃ

'গত ২০শে মার্চ তারিখে শোভাবাজারে ২নং রামকানাই লেনে বিখ্যাত ধনী অটল দত্তকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁকে যে খুন করা হয়েছিলো তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এবং হত্যাকারী ব'লে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই হরেন্দ্রকুমার মিত্রই যে এ-কাজের জন্য দায়ী, তারও প্রমাণের অভাব নেই।

অটলবাবু ছিলেন বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। তাঁর এক-

মাত্র ভগ্নী কৃষ্ণনগরে থাকেন তাঁর একমাত্র কন্যাকে নিয়ে। এই কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহ দেবার জন্য হরেন্দ্রবাবু উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন। তিনি মৃত ব্যক্তির বাল্যবন্ধু, তার উপর নিজে উকিল। নিজের ছেলের সঙ্গে লীলার বিয়ে দিয়ে অটলবাবুর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, সমস্ত প্রমাণ থেকে তা-ই মনে হয়। এদিকে, যে কারণেই হোক, হরেন্দ্রবাবুর ছেলের সঙ্গে ভাগনির বিয়ে দেবার ইচ্ছা অটলবাবুর একেবারেই ছিলো না। তিনি নাকি বলতেন যে ভাগনির বিয়েই তিনি দেবেন না—সেটা নিশ্চয়ই হরেনবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার একটা অছিলা মাত্র। খুব সম্ভব, তাঁর বন্ধুর চরিত্র তিনি জানতেন, তাই এ প্রস্তাবে অনেক চেষ্টা ক'রেও তাঁর সম্মতি হরেন্দ্রবাবু পাননি।

এদিকে এই ঘটনার মাস দেড়েক আগে অটলবাবু চঞ্চল নাগ নামে একটি যুবককে তাঁর সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন। ছেলেটিকে দেখে শুনে তাঁর বড়ো ভালো লাগে—তিনি স্থির করেন একে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন। এ-প্রস্তাব চঞ্চলের কাছে তিনি নিজমুখে করেন, এবং তাকে দু'তিন দিন সময় দেন ভেবে দেখবার জন্য।

সেই সময়েই ঈস্টরের ছুটিতে হরেন্দ্রবাবু তাঁর কর্মস্থল পাটনা থেকে কলকাতায় আসেন, এসে অটলবাবুর বাড়িতেই ওঠেন। ছেলের বিবাহের প্রস্তাবটা পাকা করবার উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছিলেন। তাঁর আসবার পরের দিন বিকেলের

কাল-বৈশাখীর ঝড়-



"খবরদার! কোনো জিনিসে হাত দেবেন না

দিকে অটলবাবুর ঘরে ব'সে চঞ্চল তাঁর পোষ্যপুত্র হবার সম্মতি জানায়।

তখন সে-ঘরে হরেন্দ্রবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং এ-ব্যাপারে চঞ্চলের প্রতি তিনি স্পষ্টতই খুব বিরক্তি প্রকাশ করেন। তারপর চঞ্চল ঘর থেকে বেরিয়েই শুনলো ঘরের মধ্যে দুই বন্ধুতে বেশ চটাচটি চলেছে। সে তার ঘরে এসে হরেন্দ্র-বাবুর নিজের হাতে লেখা ও স্বাক্ষরিত একখানা চিঠি পেলো —তাতে তিনি রীতিমত শাসিয়ে লিখেছেন যে অটলবাবুর প্রস্তাবে, অর্থাৎ তাঁর পোষ্যপুত্র হ'তে রাজি হ'লে, চঞ্চল কিংবা স্বয়ং অটলবাবু কারুরই ভালো হবে না।

এর খানিক পরেই চঞ্চল পাশের ঘর থেকে একটা ভীষণ চীৎকার শুনতে পেলো—"মেরে ফেললো! খুন ক'রে ফেললো! কে আছো! বাঁচাও!"

সে ছুটে পাশের ঘরে এলো, কিন্তু দরজার ধারে হরেন্দ্রবাবু তার হাত চেপে ধরলেন—কিছুতেই ঘরের মধ্যে যেতে দেবেন না। সে জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে দেখলো অটলবাবু মৃত অবস্থায় মেঝেতে প'ড়ে আছেন—রক্তে তাঁর গায়ের জামা ও মেঝের কার্পেট লাল হ'য়ে গেছে! পাশে প'ড়ে আছে একখানা খোলা ছুরি— এই যে, এই সেই ছুরি—তার ডাঁটে হরেন্দ্রবাবুর নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা—এই দেখুন, H. M.

খানিক আগেই চঞ্চল হরেন্দ্রবাবুর হাতে ঠিক এই ছুরিটাই

দেখেছিলো। তর্কাতর্কি হ'তে হ'তে রাগ সামলাতে না পেরে হরেনবাবু তাঁর বন্ধুর ঘাড়ে এই ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলেন—ঘাড়ের একটা রগ কেটে গিয়েছিলো আর তারই ফলে অটলবাবুর মৃত্যু হয়।

হরেন্দ্রবাবু কাণ্ডটা ক'রেই ভয় পেয়ে ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনে পড়লো যে ছুরিটা নিয়ে আসা হয়নি। তক্ষুনি আবার ছুটলেন, কিন্তু ঘরের দরজাতেই চঞ্চলের সঙ্গে দেখা। অনেক চেষ্টা করলেন চঞ্চলকে ঠেলে সরিয়ে দিতে, কিন্তু কিছুতেই যখন পারলেন না, অগত্যা অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন।

ছেলের বিয়ে দিয়ে যে বিরাট লাভ করবেন ব'লে হরেন্দ্রবাবুর মৎলব ছিলো, অটলবাবু চঞ্চলকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলে সেটা ফসকে যায়, তাই তিনি আর-কোনো উপায় ভেবে না-পেয়ে বাল্যবন্ধুকে একদম খুন ক'রেই ফেললেন—তাঁর দিক থেকে এতে এক ঢিলে দু'পাখি মারা হ'লো—প্রথমত, চঞ্চল অটলবাবুর পোষ্যপুত্র হ'তে আর পারলো না, আর তা ছাড়া মামার অবর্তমানে ভাগনির সঙ্গে নিজের ছেলের বিবাহ দেবার কোনো বাধাও আর রইলো না। এ হত্যা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি হীন স্বার্থপ্রণোদিত—এ-অবস্থায় হত্যার জন্য আইনে যে-চরম শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তা-ই হওয়া উচিত।'

পাব্লিক প্রসিকিউটরের কথা শুনে কোর্টে উপস্থিত সকলের

মধ্যে একটা শিহরণের ঢেউ খেলে গেলো। ম্যাজিস্ট্রেট আসামির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কিছু বলবার আছে ?'

হরেনবাবু বললেন, 'মাননীয় পাব্লিক প্রসিকিউটর যা বলেছেন তার বেশির ভাগই সত্যি। আমার ছেলের সঙ্গে লীলার বিয়ে দিতে আমি খুব উৎসুক ছিলুম, আর বিবাহের প্রস্তাব পাকা করবার উদ্দেশ্যেই ঈস্টরের ছুটিতে পাটনা থেকে আসি। তবে এ-কথা সত্য নয় যে অটলের সম্পত্তির মালিক হবার জন্যই আমার এই ব্যগ্রতা। অটল আমার বাল্যবন্ধু, লীলাকে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, এমনকি ওকে পুত্রবধূরূপে অনেকদিন ধ'রেই কল্পনা করছি—আমার আগ্রহের এ ছাড়া আর কারণ নেই। কিন্তু অটলের এই এক অদ্ভুত গোঁ ছিলো—কিছুতেই লীলার বিয়ে দিতে সে রাজি ছিলো না। বিশেষভাবে আমার সম্বন্ধে, কি আমার ছেলের সম্বন্ধে যে তার আপত্তি ছিলো তা নয়, ভাগনির বিয়েই সে কখনো দেবে না, এই ছিলো তার মত। এ-কথা সে যে শুধু আমাকে ফেরাবার জন্যই বলেছে তা নয়, এ-কথা সে আশে-পাশে সকলের কাছেই অনেকবার বলেছে। আমার সন্দেহ হ'তো যে তার হয়তো মাথায় একটু ছিট আছে—তার অনেক আচার-ব্যবহারই অদ্ভুত ছিলো—বাপ-মরা ভাগনির জীবনটাই হয়তো সত্যি-সত্যি সে নষ্ট ক'রে দেবে। এইজন্যও আমি লীলার বিয়ের জন্য খুব জেদ করছিলুম। চঞ্চলকে অটল পোষ্যপুত্র নেবে তা শুনে আমি অবশ্য খুশি হইনি—'

এখানে পাব্লিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন খুশি হননি ?'

'অটলের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক দিনের যোগাযোগ। এত বড়ো একটা বনেদি ঘরে হঠাৎ কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসবে, আমাদের সেটা ভালো লাগে না।'

'আর-কোনো কারণ নেই ? যে-সম্পত্তি নিজে বাগাতে চেয়েছিলেন সেটা পাছে হাতছাড়া হয় সেজন্য আপনি চিন্তিত ছিলেন না ?'

কোর্টে অনেকে মৃদুস্বরে হেসে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ব'লে উঠলেন, 'Order ! Order !'

গোলমাল থামলে হরেনবাবু বললেন, 'না, তা ছিলুম না।'

পাব্লিক প্রসিকিউটর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'এর পরে আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে কোনো ভূত এসে অটলবাবুকে খুন ক'রে গেছে ?'

'ভূত করেছে কিনা জানিনে, কিন্তু আমি করিনি। সেদিন বিকেলে চঞ্চল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে অটলের সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয় তা সত্যি। তার ফলে আমার মেজাজ এত খারাপ হ'য়ে যায় যে একটু পরেই আমি দোতলায় নিজের ঘরে চ'লে আসি। চঞ্চল যে-চীৎকার শুনেছিলো তা আমি শুনিনি। খানিক পরে আমার মনে হ'লো, খামকা ওর সঙ্গে ঝগড়া করলুম—যাই, মিটমাট ক'রে আসি। অটলের ঘরের

করবার উদ্দেশ্যও যথেষ্ট আছে। অতএব উনিই এ-কাজ করেছেন এ-কথা মনে করা ছাড়া উপায় কী ?'

এর পরে প্রধান সাক্ষী চঞ্চল নাগকে ডাকা হ'লো। চঞ্চল বেশ শান্ত মুখেই উঠে দাঁড়ালো, তার হাতে ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট। বিচারালয়ের শপথ-বাক্য উচ্চারণ ক'রে সে আস্তে-আস্তে বললে, 'আটলবাবুর জীবনের রহস্য আমি আবিষ্কার করেছি।'

সমস্ত কোর্টে একটা চঞ্চলতার সাড়া প'ড়ে গেলো। বিপক্ষের উকিল জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সেই রহস্য ?'

'তাঁর জীবনের যা রহস্য তাঁর মৃত্যুর রহস্যও তা-ই।'

বিপক্ষের উকিল বললেন, 'অত বেশি রহস্য না ক'রে সাদা কথায় বলুন।'

চঞ্চল বলতে লাগলো, 'বলছি। আমি এ-ক'দিন তাঁর বাড়ির সমস্ত কাগজপত্র ঘেঁটে তাঁর জীবনের ইতিহাস উদ্ধার করেছি। কেউই জানে না যে অটলবাবুর ডায়েরি লেখবার অভ্যেস ছিল। সেই খাতাগুলো আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি—তাঁর নিজের হাতে লেখা। কাজেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার কোনো অসুবিধে নেই।

'আমি যখন অটলবাবুর সেক্রেটারি হ'য়ে এলুম, তাঁর কোনো-কোনো অভ্যেস আমার ভয়ানক অদ্ভুত লেগেছিলো। প্রথমেই আমি লক্ষ্য করি যে তাঁর মৃত্যুভয় অসাধারণ। কোনোরকম ধারালো কি ছুঁচলো যন্ত্র তিনি তাঁর কাছাকাছি

আসতে দিতেন না—একটি আলপিন পর্যন্ত নয়। পেন্সিল কি কলমের বদলে পালক দিয়ে লিখতেন। ভাত খেতেন হাত দিয়ে। "ছুরি" কথাটা শুনলেও শিউরে উঠতেন। তাঁর চুল ছেঁটে দিতো আর নখ কেটে দিতো মাইনে-করা নর্স। ডাক্তারের আনাগোনা ছিলো সব সময়। অত্যন্ত অল্প খেয়ে অতি সাবধানে থাকতেন। তাছাড়া অত্যন্ত গ্রীষ্মেও ভারি-ভারি জামা-কাপড় পরতেন, সব সময় মোজা পরতেন, শরীরের যতটা সম্ভব ঢেকে রাখতে না-পারলে তিনি শান্তি পেতেন না।

'তাঁর এ-সব অভ্যেস সকলেই বড়োলোকের অদ্ভুত খেয়াল ব'লে মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু এর অন্য কারণ ছিলো। সে-কারণ খুব বাস্তব। তিনি হিমোফিলিয়ার রোগী ছিলেন। হিমোফিলিয়া খুব বিরল আর খুব অদ্ভুত রোগ। তাতে এমনিতে শরীরের কোনো ক্ষতিই হয় না, কিন্তু কোনো কারণে একটু রক্তপাত হ'লে সে-রক্তপাত আর সহজে থামতে চায় না। অনেক সময় খুব সামান্য কারণ থেকেই মৃত্যু হয়।'

পাব্লিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ক'রে আপনি জানলেন যে তাঁর হিমোফিলিয়া ছিলো? পোস্টমর্টেমে কি তা ধারা পড়তো না?'

'একটু ধৈর্য ধরুন, সবই বলছি। এই রোগের উল্লেখ তাঁর ডায়েরির পাতায়-পাতায়। দশ বছর আগে তাঁর ভাই ড্যালহৌসি পাহাড়ে গিয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কারণ হিমোফিলিয়া—ও-রোগ এক ভাইয়ের থাকলে প্রত্যেক

ভাইয়েরই থাকতে হবে। সামান্য একটা দাঁত তুলতে গিয়ে অজস্র রক্ত-উদ্গীরণ করতে-করতে ভাইকে যখন চোখের সামনে মরতে দেখলেন তখন থেকে অটলবাবুর জীবনের সমস্ত স্বাদ চ'লে গেলো।

এ-রোগ যে তাঁর মাতুল-বংশে আছে এ-রকম তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের শরীরে যে ঐ রোগ সত্যি-সত্যি বাসা বেঁধেছে তার এমন মর্মান্তিক প্রমাণ পেয়ে তাঁর মন একেবারে বিকল হ'য়ে যায়। ভাইয়ের মৃত্যু তাঁর মনকে এমন দারুণ নাড়া দেয় যে তার পরে তিনি কখনো কোনো পাহাড়ে পর্যন্ত যাননি।

তিনকড়িবাবু জানেন যে গত দশ বছরের মধ্যে অটল-বাবুর প্রত্যেক গ্রীষ্ম কলকাতাতেই কেটেছে। আসলে, সেই থেকে নিষ্ঠুর মৃত্যুভয় তাঁর জীবন বিষময় ক'রে তুলেছে, এবং এই আতঙ্কের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যও সত্যি-সত্যি খারাপ হ'য়ে যেতে লাগলো—তাঁর হার্টের অবস্থা যে ভালো ছিলো না, তা তো ডাক্তারই বলেছেন।

'ভাইয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই অটলবাবুর পত্নীবিয়োগ হ'লো, আর তখন থেকে তিনি শূন্যপুরীতে নিজেকে বন্দী করলেন। ছুরি কাঁচি আলপিন পেনসিল সম্বন্ধে তাঁর আতঙ্ক এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে না কি?

তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে কোনোরকমে তাঁর গা থেকে এক ফোঁটা রক্তও যদি বেরোয়, তাহ'লে সে-রক্তপাত

আর থামানো যাবে না—তাতেই তাঁর মৃত্যু হবে। সমস্ত শরীর সব সময় ঢেকেও রাখতেন ঐ কারণেই। বলা কী যায়—কখন কোথায় একটু কেটে যায়! এই ভয় প্রায় একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো—এ-ভয়ের কথা কাউকে বলতেও তিনি ভয় পেতেন, মুখ ফুটে কাউকে কক্ষনো বলেননি—এক ডায়েরির পাতায় মনের কথা লিখে যেতেন।

"একটা আলপিনের খোঁচায় যে জীবন শেষ হ'য়ে যেতে পারে, সে-জীবন ধারণ ক'রে লাভ কী?" "এ-আতঙ্ক আর কতকাল সইবো! এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।" এ-রকম কথা প্রায়ই তাঁর ডায়েরিতে পাওয়া যায়, আবার পরের পাতাতেই হয়তো লিখছেন, "না, না, বেঁচে থাকবো। যেমন ক'রে পারি, যতদিন পারি বেঁচে থাকবো। জীবনে কোনো সুখ নেই, তবু বাঁচবো।"'

চঞ্চল একটু থামলো। পাব্লিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহ'লে আপনি বলতে চান যে হরেনবাবু অটল-বাবুকে খুন করতে চাননি—এমনি আদর ক'রে গলায় ছুরির পোঁচ দিয়েছিলেন, তারপর অটলবাবু মারা গেলেন হিমোফিলিয়ায়?'

চঞ্চল বললে, 'আমাকে শেষ পর্যন্ত বলতে দিন, বেশি সময় নেবো না। হিমোফিলিয়া ভারি অদ্ভুত রোগ—তা বংশানুক্রমিক, কিন্তু মেয়েদের ও-রোগ হয় না। মেয়েরা নিজেরা ও-রোগ থেকে মুক্ত, কিন্তু—এটাই সব চেয়ে আশ্চর্য—ও-রোগ বহন

করে তারাই—অর্থাৎ রোগটা আসে মা-র দিক থেকে। এই-জন্যেই অটলবাবুর এই অদ্ভুত পণ যে কিছুতেই ভাগনির বিয়ে দেবেন না। তাঁর ভগ্নী নিজে সম্পূর্ণ নীরোগ, ভগ্নীর কন্যাও তাই, কিন্তু তাঁর বোনের যদি ছেলে হ'তো সে ও-রোগ নিয়েই জন্মাতো, এবং তাঁর ভাগনির যদি বিয়ে হয় এবং ছেলেপুলে হয়, তাহ'লে সেই ছেলেদের ও-রোগ হ'তে বাধ্য। এই রোগ নিয়ে আবার কেউ পৃথিবীতে জন্মাবে, এ-চিন্তা অটলবাবুর পক্ষে ছিলো অসহ্য—ভাগনির বিয়ে যে তিনি কিছুতেই দিতে চাননি, এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধান এইখানে।'

পাব্লিক প্রসিকিউটর বললেন, 'সবই বুঝলুম, কিন্তু অটল-বাবুর মৃত্যুর ব্যাপারটা কিছুই পরিষ্কার হ'লো না।'

'এইবার হবে। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য হরেনবাবু একেবারেই দায়ী নন।'

কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র কোর্টে মহা সোরগোল প'ড়ে গেলো, ম্যাজিস্ট্রেট বার-বার বলতে লাগলেন, 'Order! Order!'

ওদিকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো হরেনবাবুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, আর রণজিৎবাবু অত্যন্ত অবাক হ'য়ে চঞ্চলের মুখের দিকে তাকালেন।

পাব্লিক প্রসিকিউটর গম্ভীর গলায় বললেন, 'এ-কথা আপনি প্রমাণ করতে পারেন?'

চঞ্চল বললে, 'অটলবাবুর মৃত্যু ঠিক কী-ভাবে হয়েছিলো আমি ব'লে যাচ্ছি, তাহ'লেই বুঝতে পারবেন।

সেদিন বিকেলবেলা—আমি তো চ'লে এলুম ঘর থেকে—তারপর দু' বন্ধুতে কথা-কাটাকাটি শুরু হ'লো। ইনি বললেন, "আমার ছেলের সঙ্গে তোমার ভাগনির বিয়ে দিতেই হবে", উনি বললেন, "কিছুতেই দেবো না।" খানিক পরে হরেনবাবু বিরক্ত হ'য়ে তাঁর নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। অটলবাবুর মনটাও নিশ্চয়ই অস্থির হ'য়ে উঠেছিলো, গান-টান শোনবার আশায়—তিনি খুব সংগীতপ্রিয় ছিলেন—তিনি রেডিও খুললেন। রেডিওতে একটা "রোমাঞ্চকর" নাটক হচ্ছিলো।

আমি আগেই বলেছি, মৃত্যুভয়ে অটলবাবু কেমন যেন আধ-মরা হ'য়ে গিয়েছিলেন—আকাশে ঝড় উঠলে কি মেঘ ডাকলেই তাঁর প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থা হ'তো—হার্টও তাঁর দুর্বল হ'য়ে গিয়েছিলো।

রেডিওতে ঐ নাটক চলেছে, ইতিমধ্যে বাইরে কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠলো। দু'দিন আগেই আমি স্বচক্ষে দেখেছি ঝড় উঠলে তিনি কী ভয়ানক ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন! ভয় পেয়ে হয়তো ভেবেছিলেন আমাকে ডাকবেন, কিন্তু তক্ষুনি ঘরের মধ্যে এক প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেলো—'মেরে ফেললে, খুন ক'রে ফেললে, কে আছো বাঁচাও!'

ঐ চীৎকারই আমি শুনেছিলুম—ওটা রেডিওর নাটকেরই একটা কথা। পরমুহূর্তেই কড়কড় শব্দে বাজ পড়লো, সঙ্গে-সঙ্গে

ঘরের ইলেকট্রিক কারেন্ট গেলো বন্ধ হ'য়ে—ঝড়ের সময় প্রায়ই ইলেকট্রিসিটির গোলমাল হয়—রেডিও গেলো থেমে, আর অটলবাবু যে কী প্রচণ্ড ভয় পেলেন তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও বোধ হয় সম্ভব নয়।

প্রথমত ঐ উৎকট চীৎকার, আর সঙ্গে-সঙ্গে বাজ পড়ার শব্দ—তারপর রেডিও গেলো বন্ধ হ'য়ে। অটলবাবুর ঠিক কী মনে হয়েছিলো জানিনে, হয়তো ভেবেছিলেন তাঁর ঘরের মধ্যে সত্যি-সত্যি কেউ কাউকে খুন ক'রে ফেলছে, হয়তো মনে হয়েছিলো ঐ চীৎকার তাঁর নিজেরই গলা দিয়ে বেরিয়েছে—কিন্তু সে যাই হোক, অত ভয় তিনি সহ্য করতে পারলেন না, তক্ষুনি হার্টফেল ক'রে ম'রে গেলেন। তাঁর দেহ ঢ'লে পড়লো মেঝের উপর, সঙ্গে-সঙ্গে গোল সেণ্টার-টেবিলটি উল্টিয়ে গেলো, আর তার উপরে যে-ছুরিটি হরেনবাবু ভুল ক'রে ফেলে এসেছিলেন সেটি ছিটকে গিয়ে তাঁর ঘাড়ে বেশ জোরে চেপে বসলো, একটা রগ কেটে গিয়ে দরদর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগলো।'

পাব্লিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তাহ'লে কি ছুরিটার বিঁধে থাকা উচিত ছিলো না? ওটা তো মৃতদেহের পাশে মাটিতে প'ড়ে ছিলো, তা-ই নয়?'

চঞ্চল বললে, 'ছুরির মুখটা লাগেনি, লেগেছিলো ধারালো দিকটা, কেটে দিয়েই প'ড়ে গিয়েছিলো। খানিক আগে হরেন-বাবু যখন ছুরিটা বের ক'রে চুরুটের মুখ কাটলেন, তখনই

অটলবাবু বেশ ভয় পেয়েছিলেন ব'লে আমার মনে হয়। ও-সব জিনিস দেখলেই তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হ'তো। আমি যেদিন প্রথম ও-বাড়ি গেলুম, নতুন চাকর ভুল ক'রে খাবার টেবিলে ছুরি-কাঁটা সাজিয়ে দিয়েছিলো, তা দেখে তিনি এমন আঁৎকে উঠেছিলেন যেন ছুরি-কাঁটাগুলো সব জ্যান্ত সাপ! বোধ হয় ঐরকম চরম ভীত অবস্থায় টেবিলের উপর চকচকে ছুরিটা তাঁর চোখে পড়েছিলো, এবং তাতেই বোধ হয় তাঁর দাঁতে দাঁতে লেগে যায়! আপনারা তো জানেন যে মৃতদেহ দাঁতে দাঁত-লাগা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। ঐ ছুরিটা অটলবাবুর সামনে বের করাই হরেনবাবুর অন্যায় হয়েছিলো, আরো বেশি অন্যায় হয়েছিলো ওটা ভুলে ঐ ঘরে ফেলে যাওয়া—কিন্তু এ ছাড়া আর-কোনো অপরাধ তিনি করেননি।'

'আচ্ছা, ঐ চীৎকারটা রেডিওর নাটকের, সে-বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ?'

'সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। আমরা যখন ও-ঘরে ঢুকলুম তখন ইলেকট্রিক কারেন্ট ছিলো না। খানিক পরে যখন কারেন্ট ফিরে এলো, রেডিওতে গান বেজে উঠলো। তাতে প্রমাণ হয় রেডিওর চাবিটা আগে থেকেই খোলা ছিলো। বেতারের প্রোগ্রামে দেখলুম সেই সময়ে একটা নাটক হচ্ছিলো—একটা "thriller"। পরে আমি রেডিওর আপিশে গিয়ে সেই নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখে এসেছি, তাতে একজন পুরুষের মুখে ঠিক ঐ কথা আছে, আর সেটা খুব চেঁচিয়ে বলবার নির্দেশও আছে।'

'আচ্ছা, চীৎকারটা না-হয় মিথ্যে, কিন্তু তাই ব'লেই কি প্রমাণ হ'য়ে গেলো যে অটলবাবু স্বাভাবিকভাবে মরেছেন ?'

'তা হয় না, কিন্তু তারও প্রমাণ আছে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট হচ্ছে—"Death caused by heart-failure"। অবশ্য প্রচুর রক্তপাত হ'তে-হ'তেও মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অটলবাবু আগে মরেছিলেন, তারপর তাঁর গলায় ছুরি লেগেছিলো। তা যদি না হ'তো, তাহ'লে হিমোফিলিয়া রোগীর এত রক্তপাত হ'তো যে কার্পেটের শুধু একটা সবুজ ফুল নয়, সমস্ত কার্পেটই লালে লাল হ'য়ে যেতো। ঐ কাটা ঘা থেকে রক্ত পড়া যে খানিক পরেই থেমে গিয়েছিলো তাতেই প্রমাণ করে যে, ঐ আঘাত লাগবার আগেই তিনি ম'রে ছিলেন, অর্থাৎ ছুরিটা বসেছিলো মৃতদেহের গায়ে।'

'কিন্তু অটলবাবুর হয়তো হিমোফিলিয়া ছিলোই না, হয়তো তাঁর ধারণা ভুল ছিলো।'

'তা হ'তেই পারে না। এক ভাইয়ের ও-রোগ থাকলে আর-এক ভাইয়ের থাকতেই হবে।'

'তাহ'লে পোস্টমর্টেমে ধরা পড়লো না কেন ?'

'হিমোফিলিয়ার জন্য রক্তের যে বিশেষ রাসায়নিক পরীক্ষা করা দরকার তা করা হয়নি ব'লে। ও-রকম সন্দেহ তো কারো হয়নি। কিন্তু হার্ট যে দুর্বল ছিলো তা তো পরীক্ষায় ধরা পড়েছে।'

পাব্লিক প্রসিকিউটর বললেন, 'বেশ, আপনার আর-কিছু বলবার দরকার নেই।'

চঞ্চল বললে, 'আর একটি কথা ব'লে আমি শেষ করবো। হরেনবাবুর নির্দোষিতার আর-একটা প্রমাণ আমি পকেটে এনেছি। এই দেখুন—'

এই ব'লে সে পকেট থেকে সেই দলিলের খসড়া দুটো বের করলে।

'এ দুটোই হরেনবাবুর নিজের হাতের লেখা, তাঁর বিছানার তলায় পাওয়া গিয়েছিলো। দেখুন।'

পাব্লিক প্রসিকিউটর কাগজ দুটোর উপর চোখ বুলিয়ে হরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—'এ আপনার হাতের লেখা?'

'হাঁ।'

'কবে লিখেছিলেন?'

'অটল মরবার আগের দিনই। তার ইচ্ছেমতোই খসড়া করা হয়েছিলো—ইচ্ছে ছিলো আমি চ'লে যাবার আগেই দলিল পাকা করা হবে, কিন্তু তা তো আর হ'লো না।'

চঞ্চল বললে, 'এই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে অটলবাবুর হরেনবাবুর সম্পত্তির উপরে লোভ ছিলো না? আমাকে পোষ্যপুত্র নেবার দলিল তো তিনিই করেছিলেন—তাঁর নিজের এ-বিষয়ে খুবই অমত ছিলো—কিন্তু বন্ধুর ইচ্ছেমতো উকিলের কাজটুকু ক'রে দিয়েছিলেন। এদিকে অটলবাবুর উইলের খসড়াতেও বোঝা যায় যে ভাগনির বিবাহে তাঁর অনিচ্ছা

হরেনবাবুকে ফেরাবার অছিলামাত্র নয়—বিয়ে করলে ভাগনি কিচ্ছু পাবে না এ-কথাই স্পষ্ট লেখা আছে। এই উইল হরেনবাবুর সাহায্যেই তৈরি করা হচ্ছিলো—এতে বোঝা যায় অটলবাবু বন্ধুকে যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন—তাছাড়া এই উইলের খসড়া লেখা হবার পরেও তো হরেনবাবু বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে পিড়াপিড়ি করছিলেন। যদি টাকার উপরেই তাঁর লোভ, তাহ'লে তো তখনই তাঁর স'রে পড়া উচিত ছিলো।'

এই ব'লে চঞ্চল ব'সে পড়লো।

* * *

কোর্ট যখন ভাঙলো, চঞ্চলকে ছোটো একটি দল ঘিরে ফেললো। সকলেই তার সঙ্গে কথা বলতে চায়—বিশেষ ক'রে খবরের কাগজের লোকরা তাকে কিছুতেই আর ছাড়ে না।

অনেক চেষ্টায় সেই ভিড় ঠেলে চঞ্চল, রণজিৎবাবু আর হরেনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

রণজিৎবাবু তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'সাবাস ছেলে! তুমি একেবারে পাকা ডিটেকটিভ হ'য়ে উঠেছো দেখছি! আমার তো এ-সব কথা কিছুতেই মনে আসতো না।'

চঞ্চল বললে, 'উঃ, এর জন্যে কি এ ক'দিন আমাকে কম খাটতে হয়েছে! নাওয়া-খাওয়া ছিলো না। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছে যে ব্যাপারটা যত সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ নয়—ভিতরে কিছু গোলমাল আছে। আলো জ্বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই রেডিওতে যেই গান বেজে উঠলো, অমনি চট ক'রে

আমার সন্দেহ হ'লো। রেডিওটা তাহ'লে খোলা ছিলো! কেন খোলা ছিলো? কে খুলেছিলো? এই ভাবতে-ভাবতেই খোঁজ নিলুম সেই সময়ে কী প্রোগ্রাম হচ্ছিলো। হচ্ছিলো নাটক। অমনি আমার মন ছাঁৎ ক'রে উঠলো—ঐ চীৎকার তাহ'লে রেডিওর নয় তো? ছুটলুম রেডিওর আপিশে। যে-মুহূর্তে প্রমাণ হ'লো যে চীৎকারটা মিথ্যে, অমনি লেগে গেলুম অন্যান্য তথ্য সন্ধানে। অটলবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে সে-সব বেরুলো।'

'তুমি তো কম চাপা নও, চঞ্চল', বললেন রণজিৎবাবু। 'আমাকে একটি কথাও বলোনি!'

'ইচ্ছে ক'রেই বলিনি। নিজে-নিজে সবটা করবো এই ইচ্ছে ছিলো।'

রণজিৎবাবু আবার বললেন, 'সাবাস!'

চঞ্চল বললে, 'রেডিওটা যদি তখন বেজে না-উঠতো, তাহ'লে আমারও মনে কোনো সন্দেহ হ'তো না। ঐ রেডিওই আপনাকে বাঁচালো, হরেনবাবু!'

হরেনবাবু হেসে বললেন, 'সেটা বললে ভুল বলা হয়, কারণ ঐ রেডিওর গান তো আরো অনেকে শুনেছিলো। আমাকে বাঁচালো তোমার বুদ্ধি আর তোমার পরিশ্রম—নয়তো তোমার বন্ধু রণজিৎবাবু তো আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণই ক'রে এনেছিলেন।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'সত্যি, আপনার উপর দিয়ে কী ঝড়ই গেলো! আমি অত্যন্ত দুঃখিত, হরেনবাবু—কিন্তু মানুষ-

মাত্রেরই ভুল হয়। তাছাড়া কেসটার চারদিকের ঘটনা আপনার বিরুদ্ধে এমন মিলে গিয়েছিলো যে, এতে যে কোনো গলদ থাকতে পারে তা কারুর মনে হবারই কথা নয়—অবশ্য চঞ্চলের কথা আলাদা। যাকগে, এ-সব কথা এখন ভোলবার চেষ্টা করুন, চলুন কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খাওয়া যাক্।'

শেষ